মুক্তপুরুষ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

॥ শ্রীচিত্রগুপ্ত ॥

সিটি বুক এজেন্সী
প্রকাশক ও পরিবেশক

৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দাশগুপ্তকে—

॥ লেখক ॥

॥ এক ॥

কথামৃত

কথায় গরল, কথায় সুধা।

সাপের বিষ দাঁতে। মানুষের বিষ জিভে। আবার দেখ সেই মানুষের বাক্যেই সুধা ঝরে। কিন্তু সে মানুষটি কেমন? তুমি-আমি? না। সংসারে যারা সার ছেড়ে সং নিয়ে আছে? না।—যে সং ছেড়ে সার নিয়ে থাকে, সে। দেবতারা অমৃত পান করে অমর হয়ে আছেন। সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠেছে। হৃদয় সমুদ্র মন্থন করে গরলও ওঠে অমৃতও ওঠে। ভিতরে যে বাসুকিটি সহস্র ফণা তুলে অবিরত দুলছে, সে গরল বেরিয়ে আসে মানুষের জিভে। আবার অমৃতের আস্বাদ পেতে চাও? মানুষের জিভই তোমাকে সে আস্বাদ দেবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগরকে বলেন বিদ্যেসাগর, ক্ষীর সমুদ্র।

—এতদিন খাল বিল দেখেছি, আজ এলাম সাগরে।

কথার বিকাশটি দেখ। সুন্দর উপমা।

—তাহলে একটু নোনা জল নিয়ে যান।

—না'গো না, তুমি হচ্ছ ক্ষীর সমুদ্র। তুমি সিদ্ধ হয়েছ।

চমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর। বলেন কি! আমি তো কখন সাধন ভজন করিনি। আমি সিদ্ধ হব কি করে?

সে কিগো! তোমার এত দয়া, তুমি সিদ্ধ নয়ত কে সিদ্ধ? আলু পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়। তুমিও নরম হয়েছ, বুঝলে

বিদ্যেসাগর? তুমি কিসে সিদ্ধ হয়েছ জান? জ্ঞানাগ্নিতে। আর জ্ঞানাগ্নি যদি একবার জ্বলে তখন সব একাকার। তখন স্বপ্নই বা কি আর জাগরণই বা কি! শোন—

এক কাঠুরে স্বপ্ন দেখছে। এমন সময় একটি লোক এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। কাঠুরে তেড়ে গেল। তুই আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলি কেন? আমি বেশ রাজা হয়েছিলাম। এই যুদ্ধে যাচ্ছি, এই পাত্র-মিত্র নিয়ে সভা করছি, রাণীরা এসে সেবা করছে, আর আমি রাজা হয়ে রাজ্য করছি। লোকটি বলল, ওতো স্বপ্ন। কাঠুরে বলল, তুই কিছুই জানিস না। এই আমি কাঠুরে যেমন সত্য, রাজাও তেমন সত্য।

বুঝলে বিদ্যেসাগর? ঠাকুর বললেন,—যা জাগরণ ভাবছি কে বলবে তা স্বপ্ন না জাগরণ? আর যখন একেবারে ঘুমোব কে জানে তখন অনুভব করব কিনা জেগে আছি! আর এতদিন যা অনুভব করেছি, তা আকাশ-কুসুম। তাই আমি থাকব হকের ঘরে, যাব না কুহকের ঘোরে। সংসারেই থাকব। সং ফেলে সারকে নিয়ে। চালুনি না হয়ে কুলো হয়ে থাকব। জাঁতি হব না। যারা জাঁতি তারা আদাড়ে। যা পায় দু' টুকরো করে দেয়। শুধু তর্ক আর বিতণ্ডা। তাদের ধারণায় কিছু থাকে না। সব কিছুই তারা তর্কের জাঁতিতে ফেলে কুট্ করে টুকরো করে ফেলে। আবার শোন, বিষবৃক্ষও আছে, চন্দন তরুও আছে। যেমন বিদ্যার পাশে মহাবিদ্যা। আবার মহা অবিদ্যাও এই মহাবিদ্যা। বুঝলে, বিদ্যেসাগর তুমি সিদ্ধ হয়েছ, তুমি এসব বুঝবে।

ব্রহ্ম কি?

ব্রহ্ম হলো অনুচ্ছিষ্ট। রসনা দিয়ে তাকে উচ্ছিষ্ট করা যায় না, বলে বোঝান যায় না। বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। তবু দেখ ব্রহ্ম বাক্যের ছড়াছড়ি।

এক বাপের দুই বেটা। ব্রহ্ম বিদ্যা শিখবার জন্য বাপ দুই

বেটাকে পাঠাল গুরুগৃহে। ফিরে এলে বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, ব্রহ্ম কি?

ছেলে শ্লোক আওড়ে ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করে বাপকে শোনাল। বাপ ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, ছোট ছেলে উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। বাপ ছেলের ভাব দেখে বলল, বাপু হে মনে হচ্ছে তুমি কিছু বুঝেছ। ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর, ভক্তি কর। বিশ্বাসে মিলায়, ভক্তিতে টানে। শুধু অস্তিত্বে বিশ্বাস কর, আর কিছুই চাই না।

এক গয়লানী দুধ নিয়ে চলেছে পণ্ডিতের বাড়ি। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। ভীষণ ঝড় বৃষ্টি। নদীতে বাণ এসেছে। খেয়াঘাটে নৌকা নাই। নদীর তীরে এসে গয়লানী ভাবল, নদী পার হব কি করে! তখনই মনে পড়ল পণ্ডিত বলেছে, রাম নাম করলে বিপদ কেটে যায়। গয়লানী রাম নাম নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হয়ে গেল। পণ্ডিত গয়লানীকে দেখে অবাক। বলল, ও বুড়ী, তুই এলি কি করে?

গয়লানী বলল, কেন তুমিতো বলেছ রাম নাম করে জলে আগুনে যেখানে খুশি ঝাঁপ দিলেও বিপদ হয় না। আমি রাম নাম নিয়ে নদী পার হয়ে এসেছি। কি করে পার হলি? কেন রাম নাম নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে এলাম।

পণ্ডিত গয়লানীর সঙ্গে নদীর ধারে এলো। গয়লানী রাম নাম করতে করতে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে আরম্ভ করল। পণ্ডিত রাম রাম বলে আবার পা বাড়ায় আর মধ্যে মধ্যে কাপড় সামলায়। গয়লানী নদী পার হয়ে চলে গেল। পণ্ডিত এপারে পড়ে রইল।

রাম নামও করবে আবার কাপড়ও সামলাবে, দুটো হবে না। এমনি বিশ্বাস চাই, অন্ধ বিশ্বাস। চাই নিবিড় একাগ্রতা উদ্দাম আগ্রহ।—ধ্যানে বসা মানে বাড়ির বাইরের কপাট বন্ধ করা। সংসার হলো উঁচু নীচু। কখন ঈশ্বর চিন্তা কখন কামিনী কাঞ্চনের

আসক্তি। যেমন মাছি।—কখনো বসছে সন্দেশে কখন বসছে পচা ঘায়ে। কিন্তু ভক্তি একবার এলে উন্মাদ।

জ্ঞানী কি রকম জান? যেন কেউ কাঁচের ঘরে বাস করছে। ভিতর বার দুটোই দেখতে পায়। মহাজ্ঞানী কে? যে মায়ার ভেল্কিতে পড়ে না। জ্ঞানীও অসাবধান হলে মায়ার ভেল্কিতে পড়ে। আসলে কি জান? বিষয় চিন্তাই যোগীকে যোগভ্রষ্ট করে।

দেয়ালে গর্ত করে নেউলেরা বেশ সুখে আছে। একজন এসে নেউলের লেজে ইঁট বেঁধে দিল। ইঁটের ভারে নেউল গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। যতবার গর্তে যেতে চায় ততবারই ইঁটের ভারে গর্তের বাইরে চলে আসে।

বিষয় চিন্তা এমনি। যতবারই যোগের গর্তে যাও ততবারই টেনে আনে।

ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেমন?

তারা নুনের পুতুল। ঠাকুর বললেন, জল মাপতে নামলে নিজেরাই গলে যাবে। তখন কে কার খবর নেবে? তুমি সব জানো, তবে খবর নাই। অনেক বাবু আছেন যারা চাকর বাকরের নাম জানে না।—যেয়ো একবার দক্ষিণেশ্বরে।

ব্রহ্মকে খুঁজবে? সে হচ্ছে পেঁয়াজের খোসার মত। প্রথমে পেঁয়াজের লাল খোসা ছাড়ালে তারপর সাদা। বারবার এমনি করে ছাড়াতে ছাড়াতে দেখবে আর খোসা নাই পেঁয়াজও নাই কিছুই নাই কিন্তু কিছু ছিল। সেই কিছুটাকেই পাচ্ছ না।

ব্রহ্মের স্বরূপ যে বুঝবে তার কেমন অবস্থা? তার দেহ আত্মা আলাদা হয়ে গেছে। যেমন নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আর খোল আলাদা হয়ে যায়। আত্মাটি যেন দেহের ভিতরে নড়বড় করে। কাঁচা সুপারি বা বাদামকে ছাল থেকে তফাৎ করা যায় না

পাকলে কিন্তু খোসা ছেড়ে আলাদা হয়ে পড়ে। পাকলে রস শুকিয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান বিষয় রস টেনে নেয়।

ব্রহ্মতো নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয়, তবে কাজ করে কে? জগৎ সংসার চলে কেমন করে?

চালায় শক্তি। নিত্য আর লীলা। নৃত্যলীলা বলতে পার নিত্যলীলাও বলতে পার। ঠাকুর বলেন, কাঠামো আর প্রতিমা পুরুষ আর প্রকৃতি। সাপ আর তার তির্যক গতি।

সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, এঁকে বেঁকে চললেও সাপ। জল স্থির থাকলেও জল। যতক্ষণ স্থির ততক্ষণ পুরুষ-ভাব। প্রকৃতি তখন পুরুষে মিশে এক হয়ে আছে। যেই নড়াচড়া—তখুনি প্রকৃতি পুরুষ থেকে সরে এসে কাজ করছে।

পুরুষ হলো প্রকৃতির সাক্ষী, অকর্তা। আবার প্রকৃতিরও সাধ্য নেই পুরুষকে ছেড়ে কাজ করে।

বিয়ে বাড়িতে বসে কর্তা আলবোলায় তামাক খান। হুকুম দিয়ে এক জায়গায় বসে আলবোলা টানেন। আর গিন্নি? বাড়িময় ছুটাছুটি করছে। কাপড়ে লেগেছে হলুদের দাগ। একবার এখানে একবার ওখানে। কোন্ কাজটা হলো, কোন্‌টা হলো না তা দেখতেই গিন্নি ব্যস্ত। মাঝে মাঝে কর্তার কাছে এসে বলে যায় এটা হলো না ওটা হলো না। এটা এরকম হলো ওটা ওরকম হলো। কর্তা সব শোনেন আর ঘাড় নেড়ে সব কথায় হু হু বলে সায় দেন।

॥ দুই ॥

ওরে শোন। ব্রহ্মের চেয়ে মহামায়ার শক্তি বেশি। একদিন ঠাকুর বললেন, যেমন জজের চেয়ে পেয়াদার ক্ষমতা বেশি। পেয়াদা যদি পরোয়ানা জারি না করে তবে জজসাহেব মামলা বিচার করবেন কি করে? জজসাহেব হচ্ছেন ব্রহ্ম আর পেয়াদা হচ্ছে শক্তি।

শক্তি কে? মহামায়া। জগত সংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছে যে জ্ঞানী সে মহামায়াকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। বলে, সর সর পথ ছেড়ে দাও। তুমি না সরলে ব্রহ্মকে দেখব কি করে? যে জ্ঞানী সেই বীর। মায়াকে চিনতে পারে। আর মায়াকে যদি একবার চিনতে পার মায়া ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে।

এক গুরু, শিষ্য বাড়ি যাচ্ছে। সঙ্গে চাকর নাই। পথের মাঝে একজনকে ডেকে বলল, ওরে আমার সঙ্গে যাবি? লোকটা ছিল মুচি। বলল, ঠাকুর আমি নীচু জাত। গুরু বলল ভয় নাই, তুই কথা বলবি না, চুপ করে থাকবি। মুচি রাজি হয়ে গুরুর সঙ্গে গেল। সন্ধ্যার সময় গুরু শিষ্য বাড়িতে আহ্নিকে বসেছে। সে সময় আর একজন ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত। মুচিকে দেখে বলল ওরে আমার জুতো জোড়াটা এনে দে। মুচি চুপ করে রইল, কথা বলো না। ব্রাহ্মণ তাড়া দিল। কিরে বেটা কথা কানে যায় না বুঝি? উত্তর দিস না কেন? মুচি তবুও কথা বলে না। ব্রাহ্মণ রেগে বলল, বেটা তুই কি মুচি না চামার, ব্রাহ্মণের কথা শুনিস না যে বড়? মুচি ভয় পেয়ে কাঁপতে লাগল। তারপর গুরুর দিকে তাকিয়ে বলল, ঠাকুর মশাইগো! চিনে ফেলেছে, আমি চললাম

মায়া পালিয়ে গেল। জাত গোপন করে থাক আমিও জানতে চাইব না। গুরু মায়াকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেও ছিল বিস্মৃতি-বিভ্রমে। সেই ব্রাহ্মণ হলেন জিজ্ঞাসু। তাকে দেখেই মায়া জড়সড়। কিন্তু মায়া কি সহজে যায়? সংস্কার দোষে মায়া লেগে থাকে। মায়ার সংসারে মায়াকেই সত্য মনে হয়। জ্ঞানীরা সত্য মিথ্যা ধরতে পারেন।

এক রাজার ছেলে পূর্ব জন্মে ধোপার ঘরে জন্মেছিল। একদিন খেলা করবার সময় সমবয়সীদের বলল, এখন অন্য খেলা থাক। আমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি, তোরা আমার পিঠে হুস হুস করে কাপড় কাচ।

ঈশ্বরের চেহারাটি কেমন?

সাকার না নিরাকার?

ভক্তের কাছে সাকার জ্ঞানীর কাছে নিরাকার।

যেমন বরফ আর জল। জল জমেইতো বরফ। বরফ গলেই জল। কিন্তু জলের রূপ নাই আকার নাই। বরফের আছে।

একদিন ঠাকুর ভক্তদের বললেন—

ঈশ্বর সত্যি কি রকম তা ঈশ্বরের কাছ থেকেই জানতে হয়। আগে কলকাতায় যাও তবে তো জানবে গড়ের মাঠ কোথায় গঙ্গা কোথায়। নিমতের বামুনপাড়া যাবে? তাহলে আগে তোমাকে নিমতে যেতে হবে। না হলে শুধু ভেসে বেড়াবে। তা নয় শুধু শুধু ঈশ্বর কেমন বললেই কি জানতে পারবে? ঈশ্বর কেমন, না নায়েব গোমস্তা সংবাদ। কারু সঙ্গে কারু কথায় মেলে না। এ বলে এই হয়েছে, দেখতে এমনটি, ও বলে ওই হয়েছে দেখতে অমনটি। সবাই মনে করে আমার ঘড়িটিই ঠিক। কিন্তু কারু ঘড়িই ঠিক যাচ্ছেনা।

ঈশ্বর নিরাকারও বটে সাকারও বটে। এক ডেলে গাছও হয় পাঁচ ডেলে গাছও হয়। রৌশুন চৌকিতে দুজনে বাঁশি বাজায়।

একজন বাজায় সানাই, আর একজন ধরে পোঁ। দুটো বাঁশীতেই সাতটি ফুটো থেকেও একটাতে কেবল পোঁ ধরে।

পোঁটি হলো নিরাকার আর সানাইটি হলো সাকার। ঈশ্বর এক কিন্তু নানা ভাবে তাঁর বিকাশ।

ঠাকুর বললেন, আর একটি গল্প শোন—

একজন বলল, গাছ তলায় একটা লাল গিরগিটি দেখে এলাম। আর একজন বলল, লাল নয় সবুজ। আমিও দেখে এসেছি। আর একজন বলল, লালও নয় সবুজও নয়, নীল। আমি দেখেছি। আর একজন বলল, তোমাদের সব বোধহয় মাথা খারাপ হয়েছে, আমি দেখে এলাম গিরগিটিটা পাঁশুটে। কেউ কারও কথা মানতে চায় না। ঝগড়া আরম্ভ হলো। আর একজন লোক এতক্ষণ চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ঝগড়া লাগতে দেখে এগিয়ে এসে বলল, ভাই তোমরা ঝগড়া করছ কেন? তোমরা সবাই ঠিক দেখেছ, আমি সেই গাছটির নীচেই থাকি। গিরগিটিটা অমনি করে রং বদলায়।

একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে আসে সেখানে কাপড় রঙ করিয়ে নিতে। যে যে রঙ চায় তাকেই সে রঙের কাপড় ছুপিয়ে দেয়। নানা রকম, নীল, লাল, হলদে, বেগুনী। একজন লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। তার দিকে দৃষ্টি পড়ল রঙওয়ালার। বলল, ভাই তোমার কি রঙ চাই? কোন্ রঙে কাপড় ছোপাতে হবে? লোকটি বলল ভাই তুমি যে রঙে রঙেছ, আমাকে সে রঙে রাঙিয়ে দাও।

সাকার থেকেই চলে এসো নিরাকারে। স্থূল থেকে চলেছি সূক্ষ্মতে। আকার হচ্ছে সেতু। মেয়েরা যতদিন স্বামী না পায় ততদিন পুতুল খেলে। যেই বিয়ে হয়, সত্যিকার স্বামী পায় তখন পুতুলগুলি তুলে রাখে। ঈশ্বর লাভ হলে আর প্রতিমার প্রয়োজন কি?

ঈশ্বরের যত কাছে যাবে ততই দেখবে তাঁর নাম নাই রূপ নাই।

কি করে মূর্তি থেকে চলে আসব বোধে? সাকার থেকে নিরাকারে?

মনে কর দশভূজা ভগবতী মূর্তি। দশভূজাকে করেছি ষড়ভূজা জগদ্ধাত্রী। ষড়ভূজা হলেন চতুর্ভূজা কালী। কালী হলেন দ্বিভূজ কৃষ্ণ। কৃষ্ণ হলেন বালগোপাল। বালগোপাল কমিয়ে আনলে শিবলিঙ্গে। শিবলিঙ্গ নেমে এলেন শালগ্রাম শিলায়।

তারপর?

তারপর আর প্রতীক নাই প্রতিমা নাই। সাকার থেকে চলে গেলাম নিরাকারে।

তখন এক মাত্র ব্রহ্ম। আদি অন্তহীন অনাদি ব্রহ্ম।

ব্রহ্মসত্ত্বা, প্রকৃতি শক্তি। ব্রহ্ম মন, শক্তি ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই হলো মায়া।

ঠাকুর বললেন, কোথাও কিছু নাই ধূমধাড়াক্কা লেগে গেল। বেশ রোদ আছে, হঠাৎ মেঘ হলো। চারদিক অন্ধকার। বৃষ্টি, বজ্রপাত কত কি! আবার দেখো মেঘ কেটে গেলে রোদ উঠল। ব্যাস এর নামই মায়া।

ঈশ্বরের শক্তিতেই সব শক্তিমান।

একটা হাঁড়িতে আলু পটল উচ্ছে ভাতে দিয়ে উনুনে চড়িয়েছে। যখন ভাত ফুটছে তখন আলু পটলগুলি লাফাচ্ছে। ভাবছে আমরা আপনি লাফাচ্ছি। ছোট ছেলেরাও ভাবে বুঝি তাই! বড়রা বুঝিয়ে দেয়, ওরা নিজে লাফাচ্ছে না, হাঁড়ির নীচে আগুন আছে বলেই লাফাচ্ছে। আগুন টেনে নিলে আর লাফাবে না।

অহং হচ্ছে অভিমান! ভাবছে নিজের জোরেই টগবগ করছে। সচ্চিদানন্দ হচ্ছেন অগ্নি। এই অগ্নিটুকু সরে গেলে সব ঠাণ্ডা।

॥ তিন ॥

সবই ঈশ্বর করেছেন।

ঠাকুর বললেন, একদিন এক সাধু এক গ্রামে গিয়েছে ভিক্ষে করতে। দেখল গাঁয়ের জমিদার একটি লোককে মারছে। সাধু জমিদারকে থামাতে গেল। জমিদার রেগে সাধুকে মারতে আরম্ভ করল। মারের চোটে সাধু অজ্ঞান হয়ে পড়ল। পথ চলতি লোকেরা যেয়ে মঠে খবর দিল। মঠের সাধুরা এসে সাধুকে নিয়ে গেল। মুখে দুধ দিতেই সাধু চোখ খুলে তাকাল। একজন জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ দেখতো কে তোমাকে দুধ খাওয়াচ্ছে? সাধু বলল, ভাই যিনি মেরেছিলেন তিনিই খাওয়াচ্ছেন।

বিশ্বাস চাই। বিশ্বাসের আর এক নাম সরলতা।

এক সাধুর কাছে গিয়ে একজন লোক উপদেশ চাইল। সাধু বলল আর কি উপদেশ দেব ভগবানকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাস। লোকটি বলল ভগবানকে কখন দেখিনি তার বিষয় কিছু জানিনা কি করে তাকে ভালবাসবো? সাধু বলল এ সংসারে কাকে তুমি বেশি ভালোবাস। লোকটি বলল আমার কেউ নেই। শুধু একটা ভেড়া আছে তাকেই ভালবাসি। সাধু বলল ব্যাস ওতেই হবে, ঐ ভেড়ার মধ্যে নারায়ন আছেন, তুমি ওই ভেড়াকেই সেবা কর। লোকটি সাধুর কথা বিশ্বাস করে ভেড়াটির সেবা করতে লাগল। অনেক দিন পরে সাধুর সঙ্গে লোকটির আবার দেখা হলো। সাধু জিজ্ঞেস করল, কি হে কেমন আছ? লোকটি প্রণাম করে বলল, গুরুদেব আপনার কৃপায় ভাল আছি। আপনি যে রকম করতে

বলেছিলেন সে রকম করে উপকার হয়েছে। ভেড়ার মধ্যে আমি এক অপরূপ মূর্তি দেখতে পাই।

সাধু ভাবে আমার দর্শন হলো কই।

খুব অল্প বয়সে একটি মেয়ে বিধবা হয়েছে। স্বামীর মুখ দেখেনি। অন্য মেয়েদের স্বামী আসে দেখে, একদিন বাবাকে বলল বাবা আমার স্বামী কই? বাবা বলল গোবিন্দ তোমার স্বামী। তাঁকে ডাকলেই তিনি দেখা দেন। বাপের কথাতে মেয়ের অটল বিশ্বাস। ঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগল। গোবিন্দ তুমি এসো, আমাকে দেখা দাও।

মেয়েটির কান্না শুনে ঠাকুর দেখা দিলেন।

তাঁকে পেতে হলে আকুলতা চাই।

ছেলে ঘুড়ি কিনবে। মার আঁচল ধরে টানাটানি করছে, পয়সা চাই। মা গল্প করছে অন্য মেয়েদের সঙ্গে। ছেলের দিকে নজর নাই। কিন্তু কতক্ষণ আর নজর না দিয়ে থাকতে পারে? বলল, দাঁড়া উনি আসুন। ছেলে ভুলবে না। মা তখন মেয়েটিকে বলল, একটু বসো মা, আগে ছেলেটাকে শান্ত করে নিই।

ছেলের কান্নার কাছে মা আর কি করবে! বধির হয়ে থাকবেন সাধ্য কি! ঈশ্বরের ঘরে আমাদের হিসসা আছে। বেশি বাড়াবাড়ি দেখলে বেগতিক হলে হিসসা ফেলে দেন।

যাত্রার গোড়ায় অনেক খচমচ। তখনো কৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপ নাই। সাজ পরে আপন মনে তামাক খাচ্ছে আর গল্প করছে। যখন নারদ বীণা বাজিয়ে আসরে নেমে গান ধরে, তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারে না হুকো নামিয়ে রেখে আসরে নামে।

ঠাকুর বলতেন, তোমরা সারে-মাতে থাকো, আমি রসে বসে থাকি। আমি গোঁমড়ামুখো গোঁয়ার গোবিন্দ সন্ন্যেসী নই, আমি রসে বসে থাকব।

পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক

ফোঁটাও পড়ে না। পণ্ডিতেরা শুধু লম্বা চওড়া কথা বলে। নজর কিন্তু দেহের সুখে। কামিনী কাঞ্চনে। কেমন? যেমন শকুনি খুব উঁচুতে ওড়ে নজর থাকে ভাগাড়ে। পণ্ডিতগুলো দড়কচা পড়া, না এদিক না ওদিক। তাই ঠাকুর বলতেন, তোমরা সারে-মাতে থাকো আমি রসে বসে থাকব।

যারা জ্ঞানাভিমানী তারই শাস্ত্র বিচার আর তর্ক নিয়ে থাকে। চৈতন্য যদি একবার হয় তাহলে সব ভেসে যায়।

কুটুম্ববাড়া থেকে চিঠি এসেছে তত্ত্ব করতে হবে। সে চিঠি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কি কি পাঠাতে হবে কেউ বলতে পারছে না। খোঁজ পড়ল চিঠির। অনেক খোঁজাখুজির পর চিঠির খোঁজ পাওয়া গেল: সবাই কাড়াকাড়ি করে পড়ে দেখল পাঁচসের সন্দেশ আর রেলপেড়ে ধুতি পাঠাতে বলেছে। এবার উড়িয়ে দাও বা পুড়িয়ে দাও চিঠি। যা জানবার ছিল জানা হয়ে গেছে। এতেই কি শেষ হলো। এবার বেরুতে হবে সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড়ে। জ্ঞানীর আমার হলেই হলো। আর যারা প্রেমী তারা ঈশ্বর লাভ করে লোক শিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি মুছে ফেলে, কেউ দশজনকে ডেকে খাওয়ায়।

জ্ঞানী যেন কামারশালের লোহা, হাতুড়ি পিটছে তবু নির্বিকার। আর ভক্তি যেন কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ করার মত। ভেঙ্গেচুরে তোলপাড় করে দেয়। ভাব হস্তীও তেমন শরীরকে সুস্থ থাকতে দেয় না। বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যাবার সময় কিছু বোঝা যায় না কিছু পরে দেখা যায় কিনারায় ঢেউয়ের আঘাত লাগছে।

এক তাঁতি থাকে এক গাঁয়ে, বড় ধার্মিক। হাটে কাপড় বেচে। যা দাম ধরে, মুনাফা নেয়, সবই রামের ইচ্ছায়। একদিন ঘুম হচ্ছে না দেখে বসে বসে তামাক খাচ্ছে তাঁতি। একদল ডাকাত যাচ্ছে ডাকাতি করতে। মাল বইবার মুটে চাই, তাঁতিকে সঙ্গে নিল। গৃহস্থ বাড়িতে ডাকাতি করে ফিরে আসবার সময় তাড়া খেয়ে

ডাকাতেরা পালাল। ধরা পড়ল তাঁতি। গ্রামের লোকেরা এসে হাকিমকে বলল, হুজুর এ লোক কখন ডাকাতি করতে পারে না। হাকিম তাঁতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে ?

তঁাতি বলল, হুজুর সবই রামের ইচ্ছে। রামের ইচ্ছেয় রাত্রিতে ভাত খেলাম। রামের ইচ্ছেয় একদল ডাকাত এলো। রামের ইচ্ছেয় তারা আমাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে গেল। রামের ইচ্ছেয় ডাকাতি হলো গৃহস্থ বাড়িতে। রামের ইচ্ছেয় ডাকাতেরা মোট চাপাল আমার মাথায়। রামের ইচ্ছেয় পুলিশ এসে পড়ল হঠাৎ। রামের ইচ্ছেয আমি ধরা পড়লাম। রামেরই ইচ্ছেয় আমার হাজত বাস। আজ সকালে রামের ইচ্ছেয়, আমি হুজুরের কাছে এসেছি।

হাকিম তাঁতিকে ছেড়ে দিলেন।

তাঁতি গ্রামবাসীদের বলল, রামের ইচ্ছেয় আমাকে ছেড়ে দিল।

যা কিছু হচ্ছে সবই তাঁর ইচ্ছে।

জ্ঞানীর কাছে যা মায়া, ভক্তের তা মহামায়া।

ভক্তের চাই মূর্তি। ভাব চাই। পূজা অর্চনা চাই। সেবা করা চাই।

মহাবীর হনুমানের কাছে সীতা রাম। যশোদার চাই গোপাল।

যেমন বাড়ির বউ দেওর, ভাসুর, শ্বশুর, স্বামী সকলকে সেবা করে। কিন্তু সম্বন্ধটি একমাত্র স্বামীর সঙ্গে। জ্ঞানীর কাছে সংসার ধোঁকার টাটি, ভক্তের কাছে মজার কুটি।

যেমন ভাব তেমন লাভ।

এক বাজিকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে। আর মাঝে মাঝে বলছে, রাজা টাকা দেও, কাপড় দেও। বলতে বলতে তার জিভ তালুর মূলের কাছে উলটে গেল। অমনি কুম্ভক হয়ে গেল। আর কথা নাই শব্দ নাই। তখন সবাই তাকে কবরে পুতে রাখল। হাজার বছর পরে কে এসে সেই কবর খুঁড়ে দেখে একজন সমাধিস্থ হয়ে আছে। সাধু মনে করে সবাই তাকে পুজো করতে লাগল।

নাড়াচাড়া পেয়ে জিভ সরে গেল তালু থেকে। যেই চৈতন্য ফিরে পেল অমনি বাজিকর চেঁচিয়ে উঠল, লাগ ভেঁলকি লাগ। রাজা টাকা দাও, কাপড় দাও।

কর্মের বাড়িতে যদি একজনকে ভাঁড়ারি করা যায়, যতক্ষণ সে ভাঁড়ারে থাকে কর্তা ভাঁড়ারে যায় না। যখন ভাঁড়ারি নিজের ইচ্ছেয় ভাঁড়ার থেকে চলে, কর্তা তখন ঘরে চাবি দেয় ও নিজে ভাঁড়ারের ব্যবস্থা করে।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী বললেন, কোথায় যাও? নারায়ণ বললেন, আমার এক ভক্ত বিপদে পড়েছে তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি। কিছু পথ গিয়ে নারায়ণ আবার ফিরে এলেন। কি, ফিরে এলে কেন? লক্ষ্মী জানতে চাইলেন। নারায়ণ বললেন, ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে যেতে যেতে ধোপাদের কাচা কাপড় মাড়িয়ে দেয়। ধোপারা তাকে লাঠি নিয়ে মারতে গিয়েছিল। তাই তাঁকে বাঁচাতে যাচ্ছিলাম। লক্ষ্মী বললেন তাহলে ফিরে এলে কেন? নারায়ণ বললেন, ভক্তটি নিজেই ধোপাদের মারবার জন্য থান ইঁট তুলেছে।

একজন জিজ্ঞেসা করল ভক্ত যখন ভগবানের কাছাকাছি আসে তখন অবস্থা কেমন হয়?

কেমন হয় জানো? ঠাকুর বললেন, সমুদ্র দিয়ে জাহাজ চলেছে। সমুদ্রে আছে চুম্বকের পাহাড়। সেই চুম্বকের টানে পাহাড়ের কাছে জাহাজ এলে যে অবস্থা হয় সে রকম।

॥ চার ॥

ঠাকুর বলতেন, অন্যরা যদি কলসি তবে নরেন জালা। অন্যেরা যদি পুকুর নরেন তবে দীঘি। আর সব পোনা, কাঠি-বাটা, নরেন রাঙ্গা-চক্ষু বড় রুই। নরেন বড় ফুটোয়ালা বাঁশ, অনেক জিনিস ধরে। ও যেন খাপ খোলা তরোয়াল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও বসানো পাতাল ফোঁড়া শিব। ও হচ্ছে পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে নেয়, মাদী পায়রা চুপ করে থাকে। নরেন পদ্মের মধ্যে সহস্রদল।

কেশব সেনকে বলতেন ল্যাজ খসেছে।

বেঙাচির যতক্ষণ ল্যাজ না খসে জলে থাকে। ল্যাজ খসে পড়লে সে জলেও থাকতে পারে ডাঙায়ও থাকতে পারে। ল্যাজ হলো অবিদ্যা। অবিদ্যা চলে গেলে সংসারেও থাকতে পারে আবার ইচ্ছে হলে মুক্ত হয়েও বেড়াতে পারে।

বিদ্যাসাগরকে বলতেন, বিদ্যারসাগর, বিদ্যেসাগর, ক্ষীর সমুদ্র। আব সব জেলে ডিঙি, বিদ্যেসাগর জাহাজ।

গিরিশ ঘোষকে বলতেন, রসুনগোলা বাটি।

বাবুরামকে ডাকতেন, নতুন হাঁড়ি। দুধ রাখ খারাপ হবে না।

রাখালের বাপকে বলেছিলেন, ওল যদি ভাল হয়, তার মুখীটিও ভাল হয়। শশধর পণ্ডিতকে বলতেন, দ্বিতীয়ার চাঁদ। পূর্ণচন্দ্র বলেন নি। দ্বিতীয়ার চাঁদ দিনে দিনে বাড়ে। পূর্ণচন্দ্র ক্ষয় হয়।

শ্রীমাকে বলতেন, ছাই চাপা বেড়াল। রংটি বুঝবার উপায় নাই। আর নিজেকে বলতেন, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, শান্তিরাম সিং।

ঠাকুর বলতেন, আমাদের এখানে প্যালা লাগে না। কথাটি প্রথমে বলে যদুর মা। বাবা তোমার এখানে আমি কেন আসি জান, দাও দাও নাই। অন্য সাধুর কাছে গেলে কেবল এটি দাও উটি দাও।

এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছে। একজন লোকের শুনবার ইচ্ছে হলো। উঁকি মেরে দেখল আসরে প্যালা পড়ছে। লোকটি কেটে পড়ল। আর এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছে। খুব ভীড়। শুনল ওখানে প্যালা লাগে না। তখন কনুইয়ের গুঁতোয় লোক সরিয়ে গোঁফে চাড়া দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সামনের সারে বসে যাত্রা শুনতে লাগল।

আমাদের ভাব কি জানো?—সব মাছ খেতে ভালবাসি। ভাজা মাছ, হলুদ দিয়ে ঝোল, টক, বাটি-চচ্চড়ি সব।

ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের মত স্বভাব হয়।

বালক কোন গুণের বশ নয়। একটি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্ছে। এই খুলছে এই পরছে। কিছু পরে আর কাপড়ে মন নাই। বগলদাবা করে রেখেছে, না হয় ফেলে রেখেছে। ছেলেটিকে যদি বল, কাপড়টি কার? অমনি বলবে আমার। যদি বল, লক্ষ্মীছেলে কাপড়টি আমাকে দেবে? ছেলে অমনি ফোঁস করে উঠবে। তখন তুমি ছেলেটিকে একটি পুতুল বা বাঁশি দাও। কাপড়টি তোমায় দিয়ে দেবে। পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভাব। কিন্তু বাপমায়ের সঙ্গে অন্য জায়গায় গেলে আবার নতুন হয়। তাদের সঙ্গেও ভাব জমে। জাত অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে, ওকে দাদা বলে ডাকবি। সে বামুনই হোক আর কামারই হোক, ছেলে জানে দাদা। এক পাতে বসে খেতেও আপত্তি নাই।

এ হোল বালকের পাকা আমি।

বুড়োর আমি কাঁচা আমি।

সেটা কি রকম জানো? আমি কর্তা, এত বড় লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান, আমাকে একথা বলে! কেউ যদি বাড়িতে চুরি করে, ধরা পড়লে প্রথমে তার জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে, উত্তম-মধ্যম দিয়ে তাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। বলে,—কি! বেটা জানে না কার বাড়িতে চুরি করেছে? এত সাহস!

কারু উপরে আক্রোশ হলে সহজে যায় না। যদি বলে চলুন না ওখানে একজন সাধু আছে, দেখে আসি। ওজর দেখিয়ে পাশ কাটাবে। মনে মনে বলবে, আমি এতবড় লোক, আমি যাব ওখানে?

আমি কি আর যায়? ঠাকুর বলেন, যদি একান্তই না যাস তবে থাক শালা চাকর আমি হয়ে। আমি কর্তা-টর্তা কেউ নই, আমি সেবক। আমি বই-টই কিছু পড়িনি। কিন্তু দেখ মা'র নাম করি বলে সবাই আমায় মানে। শম্ভু মল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, শান্তিরাম সিং। আমি শান্তিরাম সিং।

যারা বদ্ধ জীব তারা অবসর পেলে আবোল-তাবোল গল্প করে। আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি, না হয় তাস খেলছি। আবার এমনি মায়া যে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে যদি দেখে প্রদীপের বেশি সলতে জ্বলছে, বলে তেল পুড়ে যাবে, সলতে কমাও। তীর্থ করতে গেলে নিজে ঈশ্বর চিন্তা করে না, পরিবারের পুঁটুলি বইতে সময় যায়।

সকলেই মেয়ে মানুষের বশ।

কাপ্তেনের বাড়ি গেলাম। সেখান থেকে যাব রামের বাড়ি। কাপ্তেনকে বললাম গাড়ি ভাড়া দাও। কাপ্তেন তার মাগকে বলল। সে মাগও আবার তেমনি—ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া করতে

লাগল। শেষে কাপ্তেন বলে দিল, রামের বাড়ি যাও ভাড়া রাম দেবে।

যাকে জিজ্ঞাসা করি তোমার স্ত্রীটি কেমন, সবাই বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারটি বড় ভাল। একজনের স্ত্রীও মন্দ নয়। সবাই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে। শব সাধনা করতে হলে পাশে চাল ভাজা ছোলা ভাজা রাখতে হয়। সাধনার সময় মাঝে মাঝে হাঁ করে ভয় দেখায়। তখন ঐ চাল ভাজা ছোলা ভাজা শবের মুখে দিতে হয়। শবটা ঠাণ্ডা হলে তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে। তেমনি সংসারের মধ্যে থেকে সাধন করতে হলে আগে পরিবারকে ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তাদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করে দিতে হয়, তবেই সাধন ভজনের সুবিধা। ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া কি সহজ কথা? মহামায়ার এমন কাণ্ড যে যার তিন কুলে কেউ নেই তাকে দিয়ে বেড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে। সেও বেড়ালের মাছ-দুধ ঘুরে ঘুরে যোগাড় করবে আর বলবে, মাছ দুধ না হলে বেড়াল খায় না কি করি বল।

কারুর হয়ত বিয়ের পরে স্বামী মারা গেল। ভগবানকে ডাক না কেন? তা হবে না, ভাইয়ের ঘরে গিন্নি হলো। মাথায় কাগা খোঁপা আঁচলে চাবি বেঁধে গিন্নিপনা করে বেড়াচ্ছে। পাড়াশুদ্ধ লোক তাকে ডরায়। বলে বেড়ায় আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না। তোর কি হলো তা আগে তাই দেখ না!

ভক্তি ঈশ্বরের প্রিয়।

কেমন প্রিয়? খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়। ভক্তদের স্বভাব হলো গাঁজাখোরের মত। গাঁজাখোর কল্‌কেতে দম লাগিয়ে কল্‌কেটা অন্যের হাতে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে, অন্য গাঁজাখোরের হাতে কল্‌কে না দিলে সুখ হয় না। ভক্তরাও তেমন

একসঙ্গে জুটলে তন্ময় হয়ে ভগবানের কথা বলে আনন্দে চুপ করে থাকে ও অন্যকে কথা বলার অবসর দিয়ে কথা শুনে আনন্দ পায়।

ভক্তি যদি একবার ধরে, তবে আনন্দরসে মাতাল করে রাখে।

ছেলে বলেছিল, বাবা একটু মদ চেখে দেখ তারপর আমাকে ছাড়তে বলতো ছাড়ব। বাবা খেয়ে বললেন, তুমি ছাড় আপত্তি নাই, কিন্তু বাছা আমাকে ছাড়তে বলো না।

শুধু পুঁথি পড়ে কি হবে? ভক্তি চাই, চাই অন্তরের টান।

একজন সমাধ্যায়ী পণ্ডিত অনেক ব্যাখ্যার পর বলল, ঈশ্বর নিরস।

ঠাকুর শুনে বললেন, আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে—গোয়ালে কি ঘোড়া থাকে?

আর একদিন বললেন, হ্যারে রামনেলো (রামলাল) হাজরা যেন কি বলছিল রে? অস্তস্ বহিস যদি হরিস? যেমন একজন বলেছিল, মাতারং ভাতারং খাতারং! যত সব গোলমেলে কথা। শাস্ত্র পড়ার দোষই ওই, তর্কবিচার এনে ফেলে।

শশধর পণ্ডিত বললেন, উপায় কি কিছু নাই?

তুমি তো ছানাবড়া হয়ে আছ গো! ঠাকুর শশধর পণ্ডিতকে বললেন, এখন দু-পাঁচ দিন রসে পড়ে থাকলে তোমার পক্ষে ভাল, পরের পক্ষেও ভাল।

শশধর বললেন, ছানাবড়া পুড়ে গেছে।

না গো না, আরশুলার রং ধরেছে!

শিবনাথ শাস্ত্রীর কথাও ঠাকুর বলতেন, আহা শিবনাথের কি ভক্তি! যেন রসে ফেলা ছানাবড়া। কিন্তু আমরা সব কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর হয়ে আছি।

সে জানো না বুঝি! বাড়িতে এক একজন পুরুষ থাকে, মেয়ে ছেলেদের নিয়ে থাকে সারাদিন। আর বাইরে ঘরে বসে ভুড়ক

ভুড়ুক করে তামাক খায়। নিষ্কর্মার শিরোমণি। তবে কখনো কখনো বাড়ির ভিতরে গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই ছেলেদের দিয়ে ডেকে পাঠায়,—বড়ঠাকুরকে ডেকে আন। বড়ঠাকুর এসে কুমড়ো কেটে দু'খানা করে দিয়ে যান। তাই নাম হয়েছে কুমড়ো কাটা বড়ঠাকুর। এ'টুকুই তার পুরুষত্ব।

মন ধোপা ঘরের কাপড়ের মত, লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজে ছোপাও সবুজ। দেখনা যদি একটু ইংরাজি পড় অমনি মুখে ইংরাজি কথা এসে পড়ে। ফুট ফাট ইট মিট! আবার পায়ে বুট জুতো শিশ দিয়ে গান করা, এসবও এসে জুটবে। আবার পণ্ডিত যদি সংস্কৃত পড়ে, শোলক বলবে। যে কালো পেড়ে কাপড় পরে আছে, দেখবে নিধু বাবুর টপ্পা ধরবে। রোগা লোকও বুট পরলে শিশ দেয়, সিড়ি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, কাগজ টাগজ পেলেই তার উপরে ফ্যাস ফ্যাস করে কলম চালায়।

ঠাকুর বললেন, বুঝলে গো, এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসত, বাইরে বেশ বিনয়ী। একদিন হৃদেকে নিয়ে আমি কোন্নগর গেলাম নৌকা করে, দেখি গঙ্গার ঘাটে সেই বামুন বসে। বোধহয় হাওয়া খাচ্ছে। আমাদের দেখে বলে উঠল, কি ঠাকুর কেমন আছো? হৃদেকে বললাম, বুঝলি হৃদে লোকটার টাকা হয়েছে। শুনছিস গলার স্বর?

॥ পাঁচ ॥

বিশ্বম্ভরের মেয়ে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করল। ছোট মেয়ে ছয় কি সাত বছর হবে। ঠাকুর দেখেননি।

অভিমান হলো মেয়ের।

আমি তোমায় প্রণাম করলাম, তুমি দেখলে না!

কই তাই নাকি?

তবে আর একবার করি। এবার ও পায়ে।

গান জান?

মাইরি জানি না।

একখানা গান শোনাও।

মাইরি বলেছি না? মাইরি বললে আর হয় বুঝি?

ও হয় না বুঝি? বেশ আমি গাই তুমি শোন।

ঠাকুর গান আরম্ভ করলেন।

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হলো সেবার। যাত্রাওয়ালারা এসেছে ঠাকুরকে দর্শন করতে, যে ছেলেটি বিদ্যা সেজেছিল তাকে দেখে ঠাকুর বললেন, তুমি বেশ ভাল করেছ, যদি কেউ গাইতে জানে কি নাচতে জানে, যে কোন একটা বিদ্যেতে ভাল হয়, সে যদি চেষ্টা করে তবে ঈশ্বর লাভ করতে পারে। তোমার বিয়ে হয়েছে? ছেলেপুলে? —আজ্ঞে হ্যাঁ একটি কন্যা গত, এখন একটি সন্তান আছে।

এর মধ্যে হয়ে গেল! তোমার এত কম বয়েস। বলি সাঁজ সকালে ভাতার মলো কাঁদব কত রাত! সংসারের সুখ দেখছ তো—

আমড়া আঁটি আর চামড়া। যাত্রাওয়ালার কাছে কাজ করছ তা বেশ কিন্তু বড় যন্ত্রণা। এখন বেশ গোলগাল—কদিন পরে গাল ত্যাবড়া পেট মোটা। যাত্রাওয়ালারা অমনি হয়। অর্থই অনর্থ বুঝলে গো? ভাই ভাই বেশ আছ, কিন্তু হিস্যে জুটলেই গোল। কুকুররা গা চাটাচাটি করছে, পরস্পরে বেশ ভাব। কিন্তু গেরস্ত যদি ভাত ফেলে দেয়, অমনি দেখ কোথায় গেল ভাবটাব শুরু হলো কামড়া কামড়ি।

কিসে কি হয় তাই বা কে বলতে পারে? মহেন্দ্র সরকার বললেন, পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল. ঘুঙরি কাশি। আমি দেখতে গেলাম। অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি না। পরে জানলাম একটা গাধা খুব জলে ভিজেছিল। মেয়েটি সেই গাধার দুধ খেয়েছিল।

বল কিগো! ঠাকুর বললেন,—এযে তেঁতুল তলায় আমার গাড়ি ছিল, তাই আমার অম্বল হলো।

একদিন ঠাকুর বললেন, হাঁগো তোমরা জান বড়বাবুদের গোলাপী আছে? শোন তবে, বড়বাবুর হাতে অনেক কর্ম—করে দিচ্ছেন না। একজন বলল, গোলাপীকে ধর তবে হবে। উমেদার গোলাপীর কাছে যেয়ে বলল, তুমি এটি না করলে হবে না। বড়বাবুকে তুমি একটু বলে দিলেই আমার কাজটি হয়ে যায়। গোলাপী ধরল বড়বাবুকে। আর কি! পরদিন থেকে বড়বাবুর অফিসে বেরুতে লাগল উমেদার। বড়বাবু সাহেবকে বললেন এ অতি উপযুক্ত লোক এদ্বারা অফিসের উপকার হবে।

আবার বললেন।

আবার কারু কারুর স্ত্রীকে আগলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। পাঁড়ে জমাদার খোট্টা বুড়ো, তার বৌয়ের বয়েস চৌদ্দ বৎসর। বুড়োর সঙ্গে থাকতে হয়। গোল পাতার ঘর, গোলপাতা খুলে খুলে লোক দেখে। মেয়েটা একদিন বেরিয়ে গেল।

কিন্তু খবরদার মেয়েমানুষের কান্না দেখে ভুলবি না। ঘোমটা দিয়ে শিকনি ফেলতে ফেলতে কান্না, ওতে ভুললেই গেলি।

সংসারে থাকো সাবধানে থাকো।

অসৎ লোক দেখলেই সাবধান হয়ে যাবে। যদি কেউ এসে বলে হুকোটুকো আছে? বলবে আছে। তারপর মাতাল। তাকে রাগিয়ে দিলে গালাগাল করে। যদি বল খুড়ো কেমন আছ? তা হলে সে খুশি হয়ে কত রকম গল্প করবে। বসবে, তামাক খাবে। চাই কি তোমার দু'একটা কাজও করে দিতে পারে।

ভক্ত হবি, সরল হবি, বোকা হবি কেন?

লোকে তোকে ঠকাবে। জিনিস কিনবি, ঠিক ঠিক দেখে নিয়ে দাম দিবি।

আবার যে সব জিনিসে ফাউ পাওয়া যায় তাও ছেড়ে দিবি না।

কামড়াবিনে তবে ফোঁস করবি। তুই যদি ভক্ত হোস তোর ভিতরটি একটা না হবে কেন? জোয়ার ভাঁটা খেলবে। কখন ডুববি কখন সাঁতার কাটবি। যে গরু বাছ-কোচ করে খায় সে ছিড়িক ছিড়িক দুধ দেয়। যে গরু গাব গাব করে খায় সে হুড়হুড় করে দুধ দেয়। এ হচ্ছে উৎপেতে ভক্তি।

কে ফোড়ন দিল, তা বটে, তবে দুধে একটু গন্ধ হবে।

হয় বটে, একটু আওটাতে হয়। দেখবে গন্ধ থাকবে না। একটু আগুনে আওটে নিয়ো। জ্ঞানাগ্নির উপর দুধটা একটু চড়িয়ে দিয়ো, গন্ধ থাকবে না।

কে বলল, ঈশ্বর দয়াময়।

কিসে দয়াময়?

কেন তিনি সর্বদা আমাদের দেখছেন, আহার দিচ্ছেন।

যদি কারো ছেলেপুলে হয়, তাদের খবর নেওয়া তাদের

খাওয়াবার ভার কার? বাপ মায়ের। বাপমা নেবে না তো কি ভিন পাড়ার লোক এসে নেবে?

সে কি। তবে তিনি কি দয়াময় নয়?

না গো না ঠাকুর বললেন, ওকথা অমনি বললাম। তিনি সবচেয়ে আপনার। তাঁর উপরে জোর চলে। তাঁকে এমন পর্যন্ত বলা যায়, দিবি না কেন রে শালা? পার অন্য কাউকে বলতে?

মানুষগুলো দেখতে সব একরকম, প্রকৃতি ভিন্ন। কারু সত্বগুণ বেশি, কারু রজগুণ বেশি, কারু বেশি তমোগুণ। সত্বগুণ কি রকম জান? বাড়িটি এখানে ভাঙ্গা ওখানে ভাঙ্গা মেরামত করে না। রজোগুণের লক্ষণ হলো, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, ছু'হাতের আঙ্গুলে আংটি। বাড়িঘর ফিটফাট। যখন পূজা করে গরদের কাপড় পরে নেয়। আর যার ভক্তির তমঃ হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত। ঈশ্বরের কাছে জোর করে। মার মার কাট কাট ডাকাত পড়া ভাব।—আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ! মানুষ ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে। মানুষের ভিতরেই নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতরে আলো।

ঠাকুর বললেন, সে কি গো! রাম বল, রহিম বল, যীশু-বল সব ঈশ্বর এক। জল, ওয়াটার, পানি। কেউ ঘাটে আসে ওয়াটার নিতে, কেউ আসে জল নিতে, কেউ আসে পানি নিতে। হিন্দুরা জল খায়, ইংরাজেরা ওয়াটার খায়, মুসলমানেরা পানি খায়। সে রকম ঈশ্বরকে আল্লা বল, গড বল, ভগবান বল, তিনি ঐ ঘাট ভরা জল।

সন্ন্যাসীরা জ্ঞান পন্থী, গৃহীরা ভক্তি পন্থী। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তোতাপুরীর কাছে দীক্ষা নিয়েও সংসারে ছিলেন, বলতেন সংসার করা দোষের নয়। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখবে।

আত্মহত্যা পাপ। ফিরে সংসারে এসে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। দেখনা উট কাঁটা ঘাস খায়। খাবার সময় জিভ ছিঁড়ে রক্ত পড়ে।

উট তবু খায়। সংসারী লোক এত শোক দুঃখ পায় তবুও সংসারের মায়া ছাড়ে না।

প্রার্থনা করতে হলে একমাত্র ভগবানের কাছে করবে।

এক ফকির গেল বাদশাহের কাছে প্রার্থনা জানাতে। বাদশাহ তখন নামাজ পড়ছিলেন। ফকির চুপ করে এক পাশে বসে রইল। শুনলো নমাজের শেষে বাদশাহ আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, আল্লা আমাকে ধন দৌলত দাও। ফকির উঠে দাঁড়াল। বাদশাহ বললেন, ফকির সাহেব আপনার কি চাই? ফকির বলল, আমার যা চাইবার আল্লার কাছেই চাইব। ভেবেছিলাম আপনার কাছে কিছু প্রার্থনা করব। কিন্তু দেখলাম আপনিও আমার মত ভিখারী, আল্লার কাছে দৌলত প্রার্থনা করছেন। তাই যদি চাইতে হয় আল্লার কাছেই চাইব।

ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। সাপেও আছেন পাখিতেও আছেন। দুষ্টেও আছেন শিষ্টেও আছেন। ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ করবে। দুর্জন থেকে দূরে থাকবে।

এক সাধুর শিষ্য হোমের কাঠ সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে। সে পথে একটা পাগলা হাতী আসছিল। সবাই বললে পালাও পালাও, সবাই পালাল। শিষ্য পালাল না। হাতীর ভিতরেও যখন নারায়ণ আছেন, তখন পালাবে কেন? দাঁড়িয়ে জোড় হাতে স্তব করতে লাগল। হাতী যেতে যেতে শিষ্যকে শুঁড়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল। শিষ্য অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল।

সব শুনে সাধুর গুরু বললেন, বাবা হাতী নারায়ণ আসছিল বটে, মানুষ নারায়ণেরা তোমাকে সরে যেতে বলেছিল, সে কথা শুনলে না কেন?

যদি দুষ্টলোক অনিষ্ট করতে আসে তা হলে কি করা উচিত?

ফোঁস করবে, না কামড়ালেও ফোঁস করতে ভুলোনা।

এক মাঠে রাখালেরা গরু চরাতে যেত, সেখানে ছিল একটা ভয়ানক বিষধর, রাখালেরা মাঠের সে দিকে কখনও যেত না। একদিন এক সাধুকে সে দিকে যেতে দেখে রাখালেরা সাবধান করে দিল। ঠাকুর ওদিকে একটা সাপ আছে, দেখলেই তেড়ে আসে যেয়োনা। সাধু বললেন ভয় নাই, আমাকে কিছু বলবে না। সাধুকে দেখেই সাপটা ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে এলো। মন্ত্রের তেজে সাধু সাপটাকে নিশ্চল করে দিল। তারপর কাছে যেয়ে বলল তোকে আমি মন্ত্র দেব। আজ থেকে কাউকে হিংসা করবি না।

সাধুর মন্ত্র পেয়ে সাপটা সত্যিই হিংসা ভুলে গেল।

রাখালেরা দেখল সাপটা আর কিছু বলে না। তাদের সাহস বাড়ল। একদিন একটা রাখাল সাহস করে সাপটার লেজ ধরে ঘুর পাক দিয়ে ফেলে দিল। সাধুর সঙ্গে আবার দেখা হলে সাপটা নিজের দুর্দশার কথা সাধুকে বলল। সাধু বলল আমি তোকে হিংসা করতে বারণ করেছি। আত্মরক্ষা করতে বারণ করিনি। এবার থেকে কেউ এলেই ফোঁস করে উঠবি। দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়। ভয় দেখাতে হয়। না হলে তারা অনিষ্ট করে।

সংসারে কি রকম করে থাকতে হবে? সংটি ছেড়ে সারটি নিয়ে—সার কে? একমাত্র তিনিই সারাৎসার।

কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়। কিন্তু মন পড়ে থাকে আড়ায়। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারে সব করবে। কিন্তু মন ফেলে রাখবে ঈশ্বরে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। তা নাহলে হাতে আঁঠা জড়িয়ে থাকে। ঈশ্বর ভক্তি রূপ তেল মেখে তবে সংসারের কাজে হাত দেবে।

ঈশ্বর কি কে জানতে পারে?

তার ব্যাপ্তি অনন্ত, তার স্বরূপ জানতে চাও? চিনির পাহাড়ের কাছে পিঁপড়ে গেলে কি পাহাড়ে স্বরূপ দেখতে পায়?

আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু হলেই হলো। আমার এক পাতকুয়া জলে কি দরকার? একঘটি হলেই হলো। পিঁপড়ে চিনির পাহাড় দিয়ে কি করবে। দু'একটা দানা হলেই হয়।

সংসার হচ্ছে আমড়া আঁটি আর চামড়া।

সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ'। দ'য়ে একবার নৌকা পড়লে আর রক্ষা নাই। তবুও মানুষ যায়। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরবার জন্য বিলের ধারে ঘুনি পেতে রাখে। ঘুনির মধ্যে জল চিক্ চিক্ করে, ছোট মাছগুলি সুখের আশায় ঘুনির মধ্যে ঢুকে পড়ে। যে পথে ঢুকেছে ইচ্ছে করলে সে পথে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু আসে না।

এক সাধু একটি কুঁড়ে বেঁধে সাধন ভোজন করত। সম্বলের মধ্যে একটি কৌপীন। ইঁদুর এসে কৌপীন কেটে দেয়। সাধু ইঁদুর তাড়াবার জন্য বেড়াল পুষল। কিন্তু বেড়াল খাবে কি? লোকের বাড়ি থেকে কতদিন আর দুধ চেয়ে আনা যায়। সাধু গরু যোগাড় করল। গরুর খাবার চাই। কতদিন লোকে খড় দেবে? সাধু চাষ আরম্ভ করল। মস্ত গোলাবাড়ি তৈরি হলো।

সাধুর গুরু এসে দেখে শুনে অবাক। বলল, কেয়া রে বেটা—এ সব কি?

সাধু বলল, গুরুজি সব এক কৌপীনকো ওয়াস্তে।

সংসারের ফাঁস এমনি করেই গলায় জড়ায়।

মান হুঁস তো মানুষ। কিন্তু কিসের মান? কোন মানটি সম্বন্ধে হুঁস চাই? আমি অমুক, আমি তমুক, আমি হ্যানো আমি ত্যানো।—না, হুঁস রাখবে আমি অমৃতের ছেলে।

এক সন্ন্যাসী গেছে গৃহস্থ বাড়ি ভিক্ষে করতে। আজন্ম সন্ন্যাসী, সংসার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। গৃহস্থের যুবতী মেয়ে ভিক্ষে দিতে এলো। সন্ন্যাসী মেয়েটির মা'কে বলল,—মা এর বুকে কি ফোঁড়া হয়েছে? মেয়েটির মা বলল,—না বাবা ওর

ছেলে হবে তাই ঈশ্বর স্তন দিয়েছেন। স্তনের দুধ খেয়ে ছেলে বাঁচবে। সন্ন্যাসী বলল, তবে আমি আর ভিক্ষে করব কেন? যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমার আহারও সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনিই আমাকে খেতে দেবেন।

॥ ছয় ॥

ঠাকুর বলতেন, আত্মীয় কালসাপ, ঘর পাতকুয়ো। ঈশ্বর ছাড়া সব ফক্কাবাজি। সব ধোঁকা, সব ভানুমতীর খেল। কিছুই আমার নয়, সবই তাঁর। মায়া ছেড়ে দয়ার দিকে যাও।

নিজেকে ভালবাসা মায়া, পরকে ভালবাসা দয়া। শুধু নিজের পরিবারের লোকদের ভালবাসি সে হলো মায়া। নিজের দেশের লোককে ভালবাসি, সেও মায়া। সব মানুষকে ভালবাসতে হবে। তাকে বলে দয়া।

বড় মানুষের বাগানে যদি কেউ দেখতে আসে, সরকার বলে আমাদের বাগান। কিন্তু মনিব যদি কোন দোষ দেখে ছাড়িয়ে দেয়, তাহলে আম কাঠের বাক্সটিও নিয়ে যাবার মুরোদ থাকে না।

গুরু শিষ্যকে বললেন, দেখ সংসার মিথ্যে, তুই আমার সঙ্গে চল। ঈশ্বরই তোর আপনার আর কেউ নয়।

শিষ্য বলল, সে কি গুরুদেব, আমার মা, বাবা, আত্মীয়, স্বজন? গুরু বলল, ও সব তোর মনের ভুল। আচ্ছা এক কাজ কর। তোকে একটা ওষুধের বড়ি দিচ্ছি। তুই খেয়ে শুয়ে থাকলে লোকে মনে করবে, মরে গেছিস। আসলে তোর জ্ঞান কিন্তু টনটনে থাকবে।

তুই সব দেখতে শুনতে পাবি। আমিও তখন সেখানে যাব। শিষ্য বলল, আচ্ছা। বাড়ি এসে বড়ি খেয়ে শিষ্য মরার মত শুয়ে রইল। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। কবিরাজ সেজে গুরুদেব এসে বলল, কি হয়েছে দেখি। দেখে শুনে গুরুদেব বলল, আমি একে বাঁচিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তার বদলে একজনকে মরতে হবে। তোমাদের মধ্যে নিজে মরে কে একে বাঁচাতে চাও? শিষ্যের মা বলল, এ আর বেশি কথা কি? কিন্তু আমি গেলে এ সংসার দেখবে কে? শিষ্যের স্ত্রী এতক্ষণ কাঁদছিল। গুরুদেব তাকে ডাকল। কান্না থামিয়ে শিষ্যের স্ত্রী বলল, কিন্তু আমি গেলে বাচ্চাগুলির কি দশা হবে? সে ভেবেই তো আমি মরতে চাই না। নাহলে আমার আর কি রইল। শিষ্যের তখন নেশা ছুটে গেছে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, বলুন গুরুদেব। সংসার আমার বোঝা হয়ে গেছে।

এই তো সংসার। সং—সার—যেখানে সংই সার।

অনুরাগ হলেই বৈরাগ্য। কিন্তু বৈরাগ্যটি হওয়া চাই তীব্র।

একবার ঘোর অনাবৃষ্টি হয়েছে দেশে। চাষীরা খাল কেটে জল আনার চেষ্টা করছে। সবাই রোজ একটু একটু করে কাটে। একজন ঠিক করল আজই নদীর সঙ্গে খালের যোগ করে দেব। কে জানে কাল যদি মরে যাই। এই ভেবে সেই চাষী খাল কেটেই চলেছে। বেলা হল দেখে চাষীবউ মেয়েকে দিয়ে তেল পাঠিয়ে চান করে খেয়ে নিতে বলল। চাষী মেয়েকে এমন ধমক দিল যে, মেয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। তখন চাষীবউ নিজেই এল ডাকতে। বউকে দেখে চাষী হাতের কোদাল উঠিয়ে তেড়ে গেল। চাষীবউ ভয় পেয়ে দৌড়ে পালাল। চাষীর কোন হুঁস নাই। সন্ধ্যা লাগবার মুখে খাল কেটে নদীর সঙ্গে যোগ

করে দিল। তারপর বাড়ি ফিরে নিশ্চিন্ত হয়ে খেয়ে ভোঁস ভোঁস করে মহা আনন্দে ঘুমোতে লাগল।

একেই বলে তীব্র বৈরাগ্য।

মন্দা বৈরাগ্য কাকে বলে জান?

আর এক চাষী, সেও মাঠে জলের জন্য খাল কাটছিল। বেলা হলে তার স্ত্রী এসে বলল, থাক আর কাটতে হবে না। বেলা হলো, এখন চান করে খেয়ে নাও। চাষী কাঁধের কোদাল নামিয়ে বলল—আচ্ছা তুই যখন বলছিস, তা হলে আজ থাক। আবার কাল দেখা যাবে।

এর নাম হলো মন্দা বৈরাগ্য।

সবার আগে চাই চিত্তশুদ্ধি। মন শুদ্ধ করলেই ভগবান এসে বসবেন সে পবিত্র আসনে।

এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটি ছেলে ছিল। লোকে তাকে ডাকত পেদো বলে। গ্রামে ছিল এক পোড়ো মন্দির। এক দিন গাঁয়ের লোকেরা হঠাৎ সেই মন্দিরে শঙ্খধ্বনি আর কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শুনে ছুটে এলো। যেয়ে দেখে পেদো এক পাশে দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে।—তখন সবাই হৈ হৈ করে উঠল।

ভগবান শঙ্খধ্বনি শুনে আসেন না। আসেন ভক্তের কান্নায়। ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়। ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে বেড়ায়। আর ভগবান কি করেন, তিনি তোমাকে দেখেন—তোমাকে বয়ে নিয়ে বেড়ায় না।

ভক্ত কতক্ষণ কাঁদে ভগবানের জন্য? যতক্ষণ ছেলে কাঁদে। ছেলে কতক্ষণ কাঁদে? যতক্ষণ মা তাকে স্তন পান করতে না দেন।—যেই মা ছেলের মুখে স্তন দিলেন অমনি ছেলের কান্না বন্ধ। তখন শুধু আনন্দ। আনন্দে দুধ খায় আর হাত নেড়ে খেলা করে।—

ভগবানের দেখা পেলেও তাই। ভক্ত তখন আনন্দে ভরপুর।

নিজে কর্তা হয়ে বসো না। কর্তা, হয়ে বসলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাবে না। ভগবান বলবেন, ওতো সাবালক হয়েছে। আমি যেয়ে কি করব ?

ভাঁড়ারে যদি কেউ থাকে, কর্তা বলেন আমি যেয়ে কি করব ? লোক তো আছে। কিন্তু এই আমিটি যাবে কি করে ? আমি রূপ ঢিপিতে ঈশ্বরের কৃপা জল জমে না। তবে উপায় ?

উপায় কান্না। দুঃখে কাঁদো, আনন্দে কাঁদো, তাঁকে পেয়ে কাঁদো, তাঁকে না পেয়ে কাঁদো।

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজ করছে, কোথায় আছে তা দেখেন না। গরু শূয়োর খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে, তবে সে লোক ধন্য। আর হবিষ্য করে যদি কামিনী কাঞ্চনে মন রাখে তবে তাকে ধিক। যদি কেউ পর্বতের গুহায় বসে গায়ে ছাই মাখে. উপোস করে, কঠোর ব্রত করে কিন্তু ভিতরে ভিতরে কামিনী কাঞ্চনের টান থাকে, সে ধিক। আর যে খায় দায় কামিনী কাঞ্চনে মন নেই সে ধন্য।

মন্তর মানে মন তোর। মন কার? ভগবানের। ভগবানের দিকে মনটি রেখো।

দু'বন্ধু বেড়াতে চলেছে। এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছে। একজন বলল, ভাই এস একটু শুনে যাই। আর একজন সেখানে দাঁড়াল না। বেশ্যালয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তার মনে বিরক্তি এলো। ভাবল, ধিক আমাকে, বন্ধু হরি কথা শুনছে আর আমি বেশ্যালয়ে পড়ে আছি। আর যে ভাগবত শুনছিল সে ভাবছে, আমি কি বোকা! , কি সব আবোল তাবোল বকছে. আর আমি এখানে বসে আছি। ওদিকে বন্ধু কেমন মজা লুটছে। এরা যখন মারা গেল। যমদূত এসে যে ভাগবত শুনছিল তাকে নিয়ে গেল। আর যে বেশ্যালয়ে ছিল তাকে বিষ্ণুদূত এসে বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল।

মন নিয়েই সব।

এক পাশে পরিবার. এক পাশে সন্তান। পরিবারকে একভাবে আর সন্তানকে আর একভাবে আদর করে। মন কিন্তু একটিই। মনেই বদ্ধ মনেই মুক্ত। মনে চাই বিশ্বাস। বিশ্বাসকে ধরে রাখতে হবে। সেই বিশ্বাসটি হারালে অমনি তুমি ডুবলে।

একজন লঙ্কা থেকে সমুদ্দুর পার হবে। বিভীষণ তার কাপড়ের খুঁটে কিছু বেঁধে দিয়ে বললেন, যাও এবার সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাও। সে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল। হঠাৎ মনে হলো. তাইত! বিভীষণ এমন কি বেঁধে দিলেন যে যার জন্য আমি বেশ জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি! এই ভেবে খুঁট খুলে দেখলে একটা পাতায় রামনাম লেখা।

লোকটির মনে অশ্রদ্ধা এলো। ওঃ! এই। যেমনি ভাবা, তেমনি অখণ্ড বিশ্বাসটি টলে উঠল, অমনি লোকটি ডুবে গেল।

ভোগান্ত না হলে ঈশ্বরের দিকে মন যায় না।

ফোঁড়ার কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপরীত হয়। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অস্ত্র ধরে।

যতক্ষণ ভোগ ততক্ষণ জ্বালা।

গেরুয়া অহমিকা আনে। সংসারে এসেছ সংসারেই থাক।

যদি কেরাণিকে জেলে দেয় জেল খাটে ছাড়া পেলে কি করে? আবার আগের মতই একটি কাজ জুটিয়ে নিয়ে কাজ করে।

হৃদয়ে জ্বেলে রাখবে আলো, মাত্র একটি। ওইটি হলো জ্ঞানচক্ষু। কিন্তু সদগুরু ধরা চাই। নাহলে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা।

একদিন একটা ব্যাঙকে সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ ব্যাঙটা যন্ত্রণায় ছটফট করে ডাকাডাকি করল। ঢোড়া সাপে ধরেছে।

তাই অত যন্ত্রণা অত আর্তনাদ্। জাত সাপে ধরলে একবারেই চুপ করে যেত।

যুদ্ধ করতে হলে কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করায় অনেক বিপদ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, ক্ষুধা তৃষ্ণার সঙ্গে, বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করা গৃহে থেকেই ভাল। যদি খেতে না পাও ঈশ্বর-টিশ্বর সব ঘুচে যাবে।

কেশব সেন এসেছেন সঙ্গে আছে আরো কতজন। গল্পে গল্পে রাত হয়ে গেল।

সবাই বলল, আজ থেকে যান।

কেশব সেন রাজি হলেন না।

কেনগো! ঠাকুর বলেলন, আঁশ চুপড়ির গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না?

একজন মেছুনী মালীর বাড়ী অতিথি হয়েছে। মাছ বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিল বলে চুপড়িটিও সঙ্গে আছে। মেছুনীকে দেওয়া হলো ফুলের ঘরে ঘুমোতে। অনেক রাত পর্যন্ত মেছুনী জেগে রইল। বাড়ির গিন্নি বলল, কি গো ছটফট করছ কেন? মেছুনী বলল, ফুলের গন্ধে ঘুম আসছে না। আমার আঁশ চুপড়ি আনিয়ে দিন। আঁশ চুপড়ি মাথার কাছে রেখে মেছুনী ঘুমোল। আঁশ চুপড়ি হচ্ছে কামিনী কাঞ্চনের সংসার। সাধু সঙ্গ হচ্ছে পুষ্প বাস।

॥ সাত ॥

নামরহস্য, বংশতালিকা, শিষ্যদের গার্হস্থ্যশ্রমের নাম।

যে রাম সেই কৃষ্ণ, দুয়ে মিলে রামকৃষ্ণ। সংসার সমুদ্রের জল মানে সং ফেলে, দুধ মানে সারটুকু গ্রহণ করে হলেন পরমহংস হংস কি করে? দুধ খেয়ে জলটুকু ফেলে রাখে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাই পরমহংস। পুরুষের মধ্যে পরমপুরুষ, হংসের মধ্যে পরমহংস এই রামকৃষ্ণ নামটি পেলেন কোথায়? পিতৃদত্ত? গুরুদত্ত? কেউ বলে পিতৃদত্ত কেউ বলে গুরুদত্ত।

'গুরুদত্ত নাম রামকৃষ্ণ নামে খ্যাত।
রামকৃষ্ণ পরমহংস ভুবনে বিদিত ॥'

ভৈরবী যোগেশ্বরী এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

'করতালি দিয়া মাগী নেচে নেচে বলে।
এইত গৌরাঙ্গদেব নিতায়ের খোলে ॥
হৃদয় আনন্দময় তাহার উচ্ছ্বাসে।
যথা তথা পুরী মধ্যে এই বার্তা ঘোষে ॥
এই রামকৃষ্ণ সেই গৌর গুণধাম।
সাব্যস্তে সহস্র দেয় শাস্ত্রের প্রমাণ ॥'

শিষ্যকে নতুন কৌপীন আর কাষায় দিল তোতাপুরী। বললে এবার তোমার নতুন নাম দেব। আমার নামও বদলে যাবে?

শুধু নাম না পদবীও বদলে যাবে। তুমি এখন সম্পূর্ণ নতুন নতুন দেশে তুমি জন্মালে।

গদাধর তাকিয়ে রইল আবিষ্টের মত।

হ্যাঁ, এখন থেকে তোমার নাম রামকৃষ্ণ। সন্ন্যাসে যখন দীক্ষা নিলে অর্থাৎ কিনা শ্রীতে অধিষ্ঠিত হলে, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ। আর পদবী? পদবী পরমহংস। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

পুঁথীর লেখা, দুই নদীর দুই ধারা। একধারা গুরুমুখী আর একধারা পিতৃমুখী। কোন্ ধারাটি আমরা নেব? কোন্ নদীর ঘাটে আমরা নামব? যে ঘাটটি সানবাঁধান শক্ত সেখানেই লোক যায়। সে ঘাটের আদর বেশি।
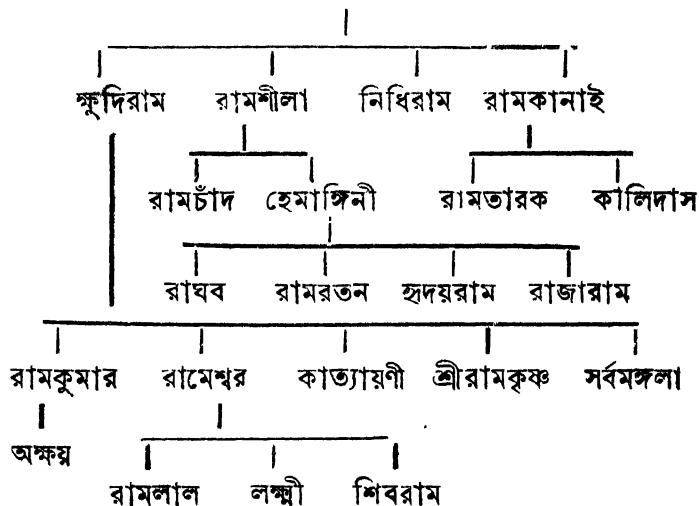
রাণী রাসমণির বরাদ্দ তালিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য……৫ টাকা (মাসিক বেতন)

রামকৃষ্ণ……কাপড় ৩ জোড়া—৪৷৷০ টাকা।

দলিল দস্তাবেজ কুলুজির সানবাঁধান ঘাট। অনুমান আন্দাজ নয়। চুলচেরা তর্ক-বিচারে প্রয়োজন নাই। সাদা চোখে দেখে নাও, যাচাই করে নাও। যে যা বলে বলুক। তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বের ঘটনা

মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের বংশ তালিকাটি দেখ। আদিতে রাম অথবা অন্তে রাম। ক্ষুদিরাম, নিধিরাম, রামকানাই, রামচাঁদ, রামতারক, রামকুমার, রামেশ্বর তারপর ধর রামকৃষ্ণ। তারপরেও আছে রামলাল, শিবরাম।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার! কাজ কি কচকচিতে? পাঁজি খুললেই প্রমাণ। বংশ তালিকায় গুরুদত্ত নাম? একি তেলে জলে একপাত্রে?

ক্ষুদিরাম গেছেন গয়ায়। গদাধর দর্শন দিলেন স্বপ্নে। চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী।

ভগবান বললেন, তোর ঘরে আমি যাব।

আমি গরীব কি দিয়ে তোমার সেবা করব?

ভক্তি দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, যত্ন দিয়ে। আমি ভক্তের দাস।

তবে এসো।

গদাধর এলেন ক্ষুদিরামের ঘরে।

ছেলের নাম হলো গদাধর। আর হলো রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রাশ নাম। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র, চতুর্থ সন্তান। মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র।

যে রাম সে কৃষ্ণ। যে কৃষ্ণ সে বিষ্ণু। যে বিষ্ণু সে গদাধর। কখন দ্বিভূজ, কখন ধরেন বাঁশী, কখন ধরেন গদা, কখন ধরেন ধনুর্বাণ। এবার দেখলেন অভয় মুদ্রা।

কৃষ্ণের বাঁশী, গদাধরের গদা, রামের ধনুর্বাণ, শ্রীরামকৃষ্ণের অভয় মুদ্রা। ভয় কি সংসারে থাক। না হলে আর সংসারের সৃষ্টি কেন? জ্ঞানে না কুলোয়, ধ্যানে না আসে তাঁকে ভক্তিতে বাঁধ। দেখবে সংসার হবে নন্দন কানন, আনন্দ নিকেতন, অমরাবতী। মন হলো দুধের মত সাদা। মনকে যদি সংসার জলে রাখ, দুধে জলে মিশে যাবে। দুধকে দই পেতে মাখন তোল। মাখনে জল মেশে না। সংসারে থাক, ঈশ্বর তত্ত্ব নিয়ে থাক, মন নিরাসক্ত থাকবে।

ঈশ্বর তত্ত্বটি কি? কোথায় পাব! ওঁ তৎসৎ, তত্ত্বমসি না সোঽহং?

যাহোক, যাকেই ঠিক মনে কর—মিছরির রুটি সিদ্ধ করেই খাও আর আড় করেই খাও মিষ্টি লাগবে। যে পথই তুমি নাও, চাই বিশ্বাস চাই আকুলতা।

বালক পাঠশালায় যায়। বনের মধ্য দিয়ে যেতে ভয় করে। মা বলে দিলেন ভয় করলেই মধুসূদন দাদাকে ডাকবি। তারপর ভয় করলেই ছেলেটি ডাকত, মধুসূদন দাদা আমার ভয় করছে। মা বলে দিয়েছেন তোমাকে ডাকতে। ভগবান এসে বললেন, ভয় কি চল।

সিমলার দত্ত বাড়ির একটি ছেলের মনে প্রশ্ন আসে। ঈশ্বরকে কি কেউ দেখেছে?

ছেলেটি ছুটল জনে জনের কাছে। কেউ বলে না। কেউ বলে, তাঁকে দেখা যায় না। তিনি নিরাকার।

তাহলে ব্রত, পূজা, ধ্যান সবই কি মিথ্যা?

একজন বলল, দক্ষিণেশ্বরে যা। সেখানে উত্তর পাবি।

ছেলেটি ছুটে এলো দক্ষিণেশ্বর।

একি! এযে পাগল।

হাঁ মশাই, আপনি ঈশ্বর দেখেছেন!

দেখেছি বইকি। যেমন তোকে দেখছি, তেমনি কথা বলেছি, দরকার হলে তোকেও দেখাতে পারি।

ছেলেটি ভাবে, পাগলটা বলে কি! যে প্রশ্ন শুনে সবাই চমকে ওঠে সে প্রশ্ন শুনে দিব্যি হাসতে হাসতে বলে. দেখেছি, কথা বলেছি, দরকার হলে তোকেও দেখাতে পারি।

ছেলেটি দক্ষিণেশ্বরে আসা-যাওয়া করতে লাগল।

একটি দুটি নয় ষোলটি ছেলে এলো দক্ষিণেশ্বরে।

শিষ্যদের নাম

সন্ন্যাস গ্রহণের

পূর্বে	পরে
নরেন্দ্রনাথ	স্বামী বিবেকানন্দ
রাখাল	,, ব্রহ্মানন্দ
বাবুরাম	,, প্রেমানন্দ
যোগেন	,, যোগানন্দ
নিরঞ্জন	,, নিরঞ্জনানন্দ
শশী	,, রামকৃষ্ণানন্দ
তারক	,, শিবানন্দ
হরি	,, তুরীয়ানন্দ
কালী	,, সারদানন্দ
শরৎ	,, অভেদানন্দ
গোপাল	,, অদ্বৈতানন্দ

লাটু	স্বামী অদ্ভুতানন্দ
সারদা	„ ত্রিগুণাতীতানন্দ
সুবোধ	„ সুবোধানন্দ
গঙ্গাধর	„ অখণ্ডানন্দ
হরিপ্রসন্ন	„ বিজ্ঞানানন্দ

নরেন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

লোকের যাওয়া আসা লেগেই আছে। কেউবা আসে দেখতে, কেউবা আসে শুনতে। যার যেমন ভাব। ছোট বড় সবাই আসে। কেশব সেন আসেন, বিজয়কৃষ্ণ আসেন, মাইকেল মধুসূদন আসেন, বিদ্যাসাগর আসেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আসেন, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার, মহেন্দ্র সরকার কেউ বাদ থাকেন না। ঠাকুর নরেনকে দেখেন ভিন্ন চোখে।

জানিস কি দেখলাম! দেখলাম কেশবের মধ্যে একটা শক্তি, নরেনের ভিতরেও ওরকম আঠারটি শক্তি, কেশবের অন্তরে জ্ঞানালোক জ্বলছে। নরেনের ভিতরে উদয় হয়েছে জ্ঞানসূর্য।

নরেন চমকে ওঠে।

মশায় বলেন কি? একথা শুনলে লোকে আপনাকে পাগল ভাববে। কোথায় জগৎ বিখ্যাত কেশব সেন আর কোথায় একটা স্কুলের ছোঁড়া নরেন। এসব বলবেন না।

না বলে কি করব রে! মা যে আমাকে ঐ রকম দেখালেন।

মা দেখালেন না নিজের মাথার খেয়ালে দেখলেন? আমাকে এত ভালবাসেন কেন? শেষে কি ভরত রাজার মত হয়ে থাকবেন?

চিন্তিত হলেন ঠাকুর। জড়ভরত আর হরিণ শিশু! তাইতো রে, কিন্তু তোকে যে না দেখে থাকতে পারি না। মা কি বলেন?

মন্দির থেকে হাসতে হাসতে ফিরে এলেন ঠাকুর।

তোর কথা আমি মানি না। মা বলেছেন তোর মধ্যে নারায়ণ

আছেন। তাকে আমি দেখতে পাই। যেদিন দেখতে পাব না, সেদিন থেকে তোর মুখও দেখব না।

বসিরহাটের শিকরা গাঁয়ের জমিদারের ছেলে রাখাল। শরণ নিয়েছে ঠাকুরের। কিন্তু বাপটি ঘোর বিষয়ী। আনন্দমোহন এসব পছন্দ করেন না। ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। ঘরে স্ত্রী আছে। জামিদারি দেখ শোন, বাপ থাকতে থাকতে কাজ শেখ। ফন্দি ফিকিরগুলো জেনে নাও। না কোথায় এক সাধুর পিছে ছুটছে। বাপ চোখ বুজলে আর বিষয় রাখতে হবে না। স্ত্রীপুত্র নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে।

ছেলেকে আটকালেন আনন্দমোহন।

রাখাল নাহলে ঠাকুরের চলে না।

মা আমার রাখালকে এনে দে।

আনন্দমোহনের কি মতি হলো, ছেলেকে ঘরে না আটকে সেরেস্তায় এনে নিজের কাছে বসালেন। একটু কাগজপত্র নাড়াচাড়া করুক। কথায় বলে কচুগাছ কাটতে কাটতে ডাকাত। কাগজপত্র নাড়তে নাড়তেই সেরেস্তা।

আনন্দমোহন নিজে ডুবে গেলেন নথিপত্রে। কঠিন মামলা খুব মনযোগ দিয়ে দেখতে হবে।

রাখাল আড় চোখে তাকায় আর একটু করে সরে। তারপর টুক করে রাস্তায় নেমে একেবারে দক্ষিণেশ্বরে।

মামলায় জিতবার কোন আশা নাই। আনন্দমোহন বুঝলেন, হার হবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। হার মামলায় জিত। সেই সাধু, যার কাছে রাখাল যায় তাঁর কিছু হাত নেই তো? হয়ত সত্যি সাধু। রাখালের মুখে শুনে হয়ত কিছু করেছেন। সাধু সন্ন্যাসীরা হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে পারে।

আনন্দমোহন ভাবলেন, যাক্ ছেলেটা আসা যাওয়া করে করুক।

ওরে রাখাল ঐ দেখ তোর বাবা আসছে।

রাখাল চমকে ওঠে। ভয়ে এতটুকু হয়ে যায়।

ঠাকুর বললেন, ভয় নাই। বাবা এলে ভক্তি করে প্রণাম করিস। বাবা সাক্ষাৎ দেবতা।

আনন্দমোহন ফিরে গেলেন একা। এসেছিলেন কড়া হয়ে ফিরে গেলেন ঢিলে হয়ে। ঠাকুরকে প্রণাম করে বললেন মাঝে মাঝে দু'একবার ছেলেকে পাঠাবেন দয়া করে। ঘরে বৌমা আছেন।

রাখাল মাঝে মাঝে যায়। খোঁজ নিতে নিজেও আসেন। ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথাটি বলেন না আনন্দমোহন।

তুমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি। যেমন করাও তেমনি করি। কিন্তু কেন এমন ছুটোছুটি করান? এমন খেলিয়ে নিয়ে লাভ কি?

ঠাকুর বললেন তাঁর ইচ্ছা। তাঁর খুশি। তিনি এসব নিয়ে খেলা করেন। বুড়িকে আগে থাকতে ছুঁয়ে ফেললে আর দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে তবে খেলা কি করে হয়? সকলে ছুঁয়ে ফেললে বুড়ি খুশি হয় না। খেলা চললেই বুড়ি খুশি।

বিজয়কৃষ্ণ আর মহিমারঞ্জন এসেছেন।

ঠাকুর বললেন, বৈষ্ণবচরণকে অনেক সুখ্যাত করে আনলাম সেজবাবুর কাছে। সেজবাবু খাতির যত্ন করলেন খুব। বৈষ্ণবচরণ বলল, কেশবমন্ত্র নিন। না হলে কিছু হবে না। সেজবাবুর মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল। সেজবাবু হলেন শাক্ত। আমি বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।—শ্রীমদ্‌ভাগবতেও নাকি ঐ কথা লেখে। কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়া যা, কুকুরের লেজ ধরে পার হওয়াও তা। সব মতের লোকরাই নিজের মতটাকে বড় করে দেখে। শাক্তরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন। শাক্তরা বলে, মা হচ্ছেন রাজরাজেশ্বরী। তিনি কি নিজে এসে পার করবেন? ঐ কৃষ্ণকে রেখে দিয়েছেন খেয়া পার করবার জন্য।

হেসে উঠল সবাই।

নিজের নিজের মত নিয়ে আবার অহঙ্কার কত! শ্যামবাজারের তাঁতীদের মধ্যে অনেক বৈষ্ণব। তাদের কত লম্বা লম্বা কথা। বলে ইনি কোন বিষ্ণু মানেন? পাতা বিষ্ণু! ও আমরা ছুঁই না। কোন্ শিব? আমাদের আত্মারাম শিব। কেউ আবার বলছে, তোমরা বুঝিয়ে দাও না, তোমরা কোন্ হরি মানো? তাতে কেউ উত্তর দিচ্ছে, আমরা আবার কেন, ওখান থেকে আরম্ভ হোক বলে অন্যদের দেখিয়ে দেয়।

এক বেগুনওয়ালাকে হীরের দাম জিগ্‌গেস করেছিল। সে বলল, আমি এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে পারি। এর একটা বেশিও দিতে পারি না।

ঈশ্বর অনন্ত হোন আর যাই হোন, তাঁর যা সার বস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে। তাই তিনি অবতার।

কি রকম জানো? গোরুর যেখানটা ছোঁবে গরুকেই ছোঁয়া হয় বটে! শিংটা ছুঁলেও গাইকে ছোঁয়া, ল্যাজটা ছুঁলেও গাইকে ছোঁয়া। কিন্তু গরুর সার বস্তু হচ্ছে দুধ, সেটি আসে বাঁট দিয়ে।

মহিমারঞ্জন বললেন, দুধ যদি দরকার হয়, গাইটার শিংয়ে মুখ দিলে কি হবে? বাঁটে মুখ দিতে হবে।

বিজয়কৃষ্ণ বললেন, কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এদিক ওদিক ঢু মারে।

ঠাকুর বললেন, আবার কেউ হয়ত বাছুরকে ও রকম করতে দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয়।

। আট ।

যে পরম আনন্দটির সন্ধান আমরা করি সে আনন্দটি কোথায় পাব ?

হরিণের নাভিতে কস্তুরী আছে, হরিণ তা জানে না। গন্ধে দশদিক আমোদিত। হরিণ ছুটে বেড়ায় তারি সন্ধানে।

আমরাও ছুটি উদভ্রান্ত হরিণের মত। আনন্দের বাসটি যে আমার বুকেই বাসা বেঁধে আছে সে খবর আমরা রাখি না।

একজন তামাকখোর অনেক রাতে প্রতিবেশীর ঘরে টিকা ধরাতে গেল। ডাকাডাকি শুনে প্রতিবেশী উঠে এলো। তামাকখোর বলল, ভাই টিকা ধরাব, তামাক খেতে হবে।

প্রতিবেশী হেসে বলল, সে কি তোমার নিজের হাতেই যে লণ্ঠন আছে।

যতক্ষণ বোধ সোধ, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা তখনই জ্ঞান।

মানুষ অষ্টপাশে বাঁধা। ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ আর পৈশূন্য।

গোপীদের বস্ত্রহরণ কি ? গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, শেষ পাশ লজ্জাও গেল।

পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।

কেউ পরীক্ষায় পাশ করে এলে ঠাকুর বলতেন, পাশ করা না পাশ পরা। বাগবাজারের পুল অনেক শেকলে বাঁধা, একটা ছিঁড়লে কিছু হবে না। অন্যগুলি ধরে রাখবে।

সংসারীর অনেক বন্ধন, একটা যায় তো আর একটা ধরে।

সংসার ছেড়ে গেরুয়া পর, অহঙ্কার ছুটবে। অহঙ্কার সহজে যায় না। অশ্বত্থ গাছের মত। কেটে দাও আবার শেকড় হবে। একটা কিছু করবার শক্তি পেলেই অহঙ্কারটি মাথা উঁচু করে ওঠে।

উপায় কি? ত্রাণ কিসে?

গুরু শিষ্যকে বললেন, যাও বনে যেয়ে তপস্যা করে সিদ্ধ হও।

শিষ্য বার বৎসর তপস্যা করল। ফিরে এসে দেখে গুরুর দরজা বন্ধ। দরজায় ধাক্কা দিল শিষ্য।

ভিতর থেকে গুরু বলল, কে?

আমি।

কণ্ঠস্বরে গুরু বুঝল শিষ্য ফিরে এসেছে। বলল, তোমার তপস্যা এখনও শেষ হয়নি। সিদ্ধিলাভ হয়নি। শিষ্য আবার বনে ফিরে গেল।

এবার শিষ্য ফিরে এলে গুরু জিজ্ঞাসা করল, কে? শিষ্য উত্তর দিল, তুমি।

গরু যতক্ষণ হাম্বা হাম্বা করে, মানে হাম হাম আমি আমি, ততক্ষণই তার যন্ত্রণা। তাকে লাঙ্গলে জোড়ে, রোদ বৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়। তারপর কশাই কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয়। তবুও নিস্তার নাই, নাড়িভুঁড়ি দিয়ে তাঁত তৈরি হয়। সেই তাঁতে ধুনকরের ধুনুচি যন্ত্র হয়। তখন আর আমি বলে না। বলে তুঁহু তুঁহু অর্থাৎ তুমি তুমি, যখন তুমি বলে তখন তার নিস্তার।

সংসারী আমি, অবিদ্যার আমি একটা মোটা লাঠির মত। কিন্তু ঈশ্বরের দাস আমি, বালকের আমি, বিদ্যার আমি এ হচ্ছে জলের উপরে রেখার মত।

আসয় সংশয় থেকেই সংসারীর সন্দেহ তিনি কি আছেন? বেশ তাহলে প্রমাণ দাও।

কিন্তু একদিনেই কি নাড়ি দেখা শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গে

অনেক ঘুরতে হয়। কোনটি কফের, কোনটা বায়ুর, কোনটা পিত্তের নাড়ি তখন বলতে পারা যায়। যাদের নাড়ি দেখা ব্যবসা তাদের সঙ্গে থাকতে হয়। তবে তো নাড়িজ্ঞান হবে। সংসারী লোক স্ত্রীর দাস।

জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, মোক্তার হয়ে বাইরে যত বোল-বোলও হোক, স্ত্রীর কাছে কেঁচো। অন্দর থেকে কোন হুকুম এলে অন্যায় হলেও সেটা রোধ করবার শক্তি নাই। ভালই হোক মন্দই হোক নিজের পরিবারকে সবাই সুখ্যাত করে।

মন হচ্ছে মত্ত করী।

হাতীর স্বভাব বাইরে দিলেও গায়ে কাদা মাখে। কিন্তু মাহুত যদি তাকে হাতীশালে ঢুকিয়ে দেয়, তখন আর গায়ে কাদা মাখতে পারে না।

মাহুত যেমন হাতীকে রাখে, গুরুও তেমন মানুষকে রাখে। একবার ঈশ্বর সত্বায় চান করিয়ে দিতে পারলে আর ভয় নাই।

একটা ছাগলের পালে বাঘিনী পড়েছিল। একটা শিকারী তাকে মেরে ফেলল।

বাঘিনীটা ছিল আসন্ন প্রসবা। মরবার সময় তার একটি ছানা হলো। ছানাটি ছাগলের সঙ্গে থাকে। ছাগলের মত ব্যা ব্যা করে ডাকে। একদিন ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে হানা দিল। বাঘের ছানাটা ভয় পেয়ে ছাগলের মত ব্যা ব্যা করে ডাকতে লাগল। বাঘ ছানাটাকে জলের কাছে টেনে নিয়ে এসে বলল, দেখ আমার যেমন মুখ তোরও তেমন মুখ। আমি যা তুইও তা। এইনে মাংস খা। বাঘের ছানাটা প্রথমে কিছুতেই খেতে চায় না। তারপর একটু একটু করে খেতে আরম্ভ করল। বড় বাঘটা বলল, এবার বুঝেছিস তুইও যা আমিও তা? এখন ছাগলের পাল ছেড়ে আমার সঙ্গে চল।

ছাগলের পালে বাঘের ছানা মানে আত্মবিস্মৃত অমৃতের পুত্র।

ঘাস খাওয়া মানে কামিনী কাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলের মত পালান মানে বদ্ধ জীবের মত ব্যবহার করা। বাঘের আক্রমণ হচ্ছে গুরুলাভ। রক্তের স্বাদ মানে হরিনামের স্বাদ। বলে চলে যাওয়া মানে চৈতন্য লাভ হয়ে গুরুর শরণ নেয়া।

একদিন কেশব সেন বললেন, আপনার কাছে এত লোক আসে কেন? কুটুস করে কামড়ে দেবেন। লোক পালিয়ে যাবে।

কামড়াব কি গো! আমি লোককে বলি তোমরা এও কর তাও কর। সংসারও কর ঈশ্বরকেও ডাক।

ঠাকুর বললেন, বুঝলে গো, যত মত তত পথ। তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত। যে কোন রকমে ছাদে ওঠা নিয়ে কথা। তা পাকা সিঁড়ি বেয়েই ওঠো, কাঠের সিঁড়ি দিয়েই ওঠো, আবার মই-দড়ি বা বাঁশ বেয়েও উঠতে পার। কিন্তু এতে একটা পা ওতে একটা পা দিলে হবে না। যেটায় দেবে একটাতেই দেবে। কালীঘাটে কেউ যায় গাড়িতে, কেউ যায় নৌকোয়, কেউ যায় হেঁটে। নানা নদী নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু যেই সমুদ্রে গেল সব একাকার। ঠাকুর আবার বললেন, রাখালেরা বাড়ি বাড়ি থেকে গরু নিয়ে যায় চরাতে। কিন্তু মাঠে গিয়ে সব গরু মিশে একাকার। আবার সন্ধ্যায় যখন ফেরে তখন নিজের নিজের বাড়িতে চলে যায়।

যতক্ষণ না ঈশ্বরলাভ হয় ততক্ষণ বার বার সংসারে আসতে হয়। কুমোরেরা হাড়ি সরা রৌদ্রে শুকুতে দেয়। ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয় তাহলে তৈরী লাল হাঁড়িগুলো ফেলে দেয় কুমোর। কাঁচাগুলো কিন্তু আবার কাদামাটির সঙ্গে মিশিয়ে চাকে ফেলে।

মাটির বাসনের মত বাসনা ভেঙ্গে গেলে তবে মুক্তি।

নর্তকীর মত থাকবে। নর্তকী যেমন মাথায় বাসন নিয়ে নাচবে মাথায় ঘড়া তবু দেখ হাসবে। তেমনি ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করবে। পানকৌড়ির মতও থাকবে। পানকৌড়ি জলে

ডুব মারছে, কিন্তু একবার পাখা ঝাড়া দিলেই গায়ে আর জল থাকে না।

আর একটা গল্প শোন—ঠাকুর আবার বললেন,—সমুদ্র দিয়ে একটা জাহাজ যাচ্ছে। কখন এসে একটা পাখি বসে আছে মাস্তুলে। হঠাৎ পাখিটার চটক ভাঙ্গল। চারদিক তাকিয়ে দেখে কোথাও কুলকিনারা নাই। ভাবল ডাঙ্গায় ফিরে যাই। পাখি উড়ে গেল উত্তর দিকে। ডাঙ্গা না পেয়ে আবার ফিরে এলো মাস্তুলে। এবার গেল দক্ষিণে। দক্ষিণ থেকেও ফিরে এলো। এমনি করে পূব পশ্চিম দেখে এসে স্থির হয়ে বসল মাস্তুলে। সংসার সমুদ্রে সমস্ত দিক ঘুরে সমস্ত দিক ত্যাগ করে বসল এসে বৈরাগ্যে একাসনে।

মানুষের মন যেন সরষের পুঁটলি। সরষের পুঁটলি যদি একবার ছড়িয়ে পড়ে তবে তা কুড়োন ভার। তেমনি মন যতই কামিনী-কাঞ্চনে ছড়িয়ে যাবে ততই তাকে গুটোনো শক্ত।

ঠাকুর তোতাপুরীকে বললেন,—তুমি ব্রহ্মলাভ করেছ, তবু তুমি রোজ ধ্যানের অভ্যাস রেখেছ কেন?

তোতাপুরী হাতের চকচকে লোটা দেখিয়ে বললেন,—তাহলে এরকম চকচকে থাকবে।

ঠাকুর বললেন,—লোটা যদি সোনার হয়? নিকৃষ্ট ধাতু বলেই রোজ ওকে পরিষ্কার করা দরকার। উৎকৃষ্ট হলে প্রয়োজন হত না।

ঠাকুর গাইছিল—আরে কেঁও রোটি ঠোকতে হো? সঙ্গে হাতে তাল দিচ্ছেন।

তোতাপুরী বিরক্ত হলেন। একি ছেলেমানুষি!—

বললেন,—কি হচ্ছে এসব!

দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম শুনতে পাও না?

তোতাপুরী গেলেন। এলেন গোবিন্দরায়।

ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। সুফিপন্থী দরবেশ। চারদিকে ঘুরে বেড়ায়।

আমাকে দীক্ষা দাও।

তুমি মুসলমান হবে!

ঠাকুরকে দীক্ষা দিলেন গোবিন্দরায়।

মথুরবাবুকে বললেন,—মুসলমানের রান্না খাব। খুব ঝাল পেঁয়াজ রসুন দিয়ে।

মথুরবাবু রাজি হল না।

বেশ মুসলমান দেখিয়ে দেবে, হিন্দু রাঁধবে।

তাই হোক। ঠাকুর বললেন,—তাড়াতাড়ি কর।

রান্না হচ্ছে। বাতাসে গন্ধ আসছে। ঠাকুর মথুরবাবুকে ডাকিয়ে বললেন,—সব ঠিক ভাবে হচ্ছে না। বামুনকে কাছা খুলে ফেলতে বল। মুসলমানের মত হোক। সানকিতে ভাত খেলেন ঠাকুর।

হৃদয় শুনে মামাকে ধরে নিয়ে গেল।

বারুদ ঘর নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে মামলা চলছে। মাইকেল এসেছেন মথুরবাবুর পক্ষ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে। বললেন,—রামকৃষ্ণকে দেখব।

খবর গেল ঠাকুরের কাছে।

আরে বাবা! ঠাকুর বলেন,—অতবড় গণ্যমান্য দুর্দান্ত সাহেব তার কাছে আমি যাব কি! হৃদে যা।

আবার তাগিদ এলো।

ঠাকুর সঙ্গে করে নারায়ণ শাস্ত্রীকে নিয়ে গেলেন।

নারায়ণ শাস্ত্রী সংস্কৃতে কথা বললেন।

মাইকেল বললেন,—বাংলায় বলুন।

তুমি নিজের ধর্ম ছাড়লে কেন?

পেটের জন্য।

পেটের জন্য তুমি বাপপিতামহের ধর্ম ছাড়লে!

মাইকেল ঠাকুরকে বললেন,—আপনি কিছু বলুন।

ঠাকুর বললেন,—কে যেন আমার মুখ চেপে ধরে আছে। তার চেয়ে তুমি গান শোন।

ঠাকুর রামপ্রসাদী গান শোনালেন।

আমি বিদ্যেসাগর দেখব। ঠাকুর বললেন,—আমাকে বিদ্যেসাগর দেখাও।

সে কথা শুনে বিদ্যেসাগর বললেন,—কেমন পরমহংস হে, গেরুয়া টেরুয়া পরেন নাকি,—না লালপেড়ে কাপড় পরেন। গায়ে জামা, পায়ে চটিজুতা, থাকেন রাসমণির কালীবাড়ি দক্ষিণেশ্বরে। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানেন না।

বিদ্যাসাগর খুসি হয়ে বললেন,—নিয়ে এসো।

সঙ্গে এলো ভবনাথ হাজরা।

ওরে আমার জামায় বুতাম নাই, খারাপ হবে না তো? বিদ্যেসাগর আমাকে অসভ্য মনে করবে না তো?

না আপমার কোন অপরাধ হবে না।

বেশ! ঠাকুর বললেন,—তবে আর কি।

ঠাকুর ঘরে ঢুকতেই বিদ্যাসাগর উঠে দাঁড়ালেন।

জল খাব।

একটি বেঞ্চিতে বসলেন ঠাকুর। সেখানে আর একটি ছেলে বসেছিল।

ঠাকুর বললেন,—এটি অবিদ্যার ছেলে, সংসারে বড় আসক্তি।

আর একটি ছেলেকে দেখিয়ে বিদ্যাসাগর বললেন,—এটি কেমন?

ভাল। ফল্গুনদীর মত, একটু খুঁচলেই জল পাবে।

মসজিদ ঘুরে ঠাকুর একদিন ব্রহ্মসমাজে গেলেন। কেশব সেন বসেছিলেম বেদীর উপরে। ঠাকুরকে দেখে তন্ময় হয়ে গেলেন কেশব।

তোমার কাছে শুনতে এসেছি গো! কিছু বলনা একটু শুনি।

আপনি বলুন।

আমি বলব? তবে গান শোন।

গাইতে গাইতে ঠাকুরের সমাধি হলো। কেশব ভক্তরা ভাবল লোকটির বোধহয় মৃগী রোগ আছে।

ভবতারিণীকে ভাবাবস্থায় ঠাকুর একদিন বললেন,—করছিস কি মা! এত লোকের ভিড় কি আন্‌তে হয়? নাইবার খাবার সময় নাই। গলা তো ভেঙ্গে ঢাক। এবার ফুটো হয়ে যাবে। এতসব অসার লোক পাঠান কেন্? কিছু ভাল লোক পাঠাতে পারিসনা।

ভবতারিণী ভাল লোক পাঠালেন।

নরেন, রাখাল, বাবুরাম, যোগেন, নিরঞ্জন, শশী, তারক, হরি, কালী, শরৎ, গোপাল, লাটু, সারদা, সুবোধ, গঙ্গাধর, হরিপ্রসন্ন। আমরা পেলাম বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, যোগানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, ত্রিগুনাতীতানন্দ, সুবোধানন্দ, অখণ্ডানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ।

॥ নয় ॥

নাম হলো দেবগ্রাম। তা বলে মনে করো না গ্রামে যারা আছেন তারা দেবতা। বরং অপদেবতা বলতে পারো। গ্রামের জমিদারের নাম রামানন্দ। ঐ নাম পর্যন্তই! কাজেকর্মে তিনি রাবণ। একেবারে রাক্ষস অবতার।

দু'একজন দেবতুল্য লোক গাঁয়ে আছেন। কিন্তু দবদবা বেশি অপদেবতাদের। দলে ভারি যে। মাণিকরাম চাটুজ্জে থাকেন দেবগ্রামে।

মাটির ঘরে খড়ো চাল। ছিমছাম বামুন পণ্ডিতের বাড়ি। রঘুবীর আছেন ঘরে। গৃহ-বিগ্রহ। বড় ছেলে ক্ষুদিরাম খুদ-কুঁড়ো যা আছে দেখাশুনা করে আর রঘুবীরের সেবা করে।

বাপ মারা গেলে বাড়ির কর্তা হলো ক্ষুদিরাম। ধার্মিক লো সত্যবাদী বলে সুনাম আছে।

ক্ষুদিরামের দু'বিয়ে। প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হলে দ্বিতীয় স্ত্রী চন্দ্রমণিকে ঘরে আনে।

ঘট বুঝে সরা!—স্ত্রীটিও স্বামীর মত। সবাই জানে যেমন কর্তা তেমন গিন্নী। সহজেই তুষ্ট, সহজেই রুষ্ট।

তুষ্ট কিসে?

ভাল কাজ কর, ভাল কথা বল, অসৎ কর্ম করো না, মিথ্যা ভাষণ দিও না, খুব খুশি। তোমাকে ডেকে বসাবে। সুখ-দুঃখের গল্প বলবে। ছলছাতুরি কর, মিথ্যাভাষণ দাও, তোমার মুখ দর্শন করবে না।

জমিদার রামানন্দ রায় একবার বিপাকে পড়লেন। মান-সম্ভ্রম নিয়ে টানাটানি। ক্ষুদিরাম সাক্ষী দিলে ভয় নাই। সবাই জানে ক্ষুদিরাম মিথ্যা বলেন না।

জমিদারের লোক এলো ক্ষুদিরামের কাছে। ক্ষুদিরাম হাঁকিয়ে দিলেন।

আবার এলো জমিদারের লোক।

ক্ষুদিরাম আবার হাঁকিয়ে দিলেন। লোভ! ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় লোভে পড়ে মিথ্যা সাক্ষী দেবে? জমিদারের লোককে বললেন,—তোমার বাবুকে বলো, ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় সাক্ষী দিলে সত্যি সাক্ষীই দেবে। যদি তোমার বাবু রাজি থাকেন এসো।

আবার এলো জমিদারের লোক।

ভট্‌চাজ মশাই, কাজটা ভাল করলেন না। জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া ভাল নয়।

আর কিছু বলবে?

আপনি আর একবার ভেবে দেখুন।

তা না হলে কি হবে?

বিপদ হতে পারে।

শুনলাম, এবার তুমি যেতে পার।

রামানন্দ এ অপমান ভুললেন না। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ক্ষুদিরামের ভিটে-মাটি উচ্ছেদ করলেন।

বললেন,—দেখি বামুন এবার কি করে! আসে কিনা আমার কাছে।

ক্ষুদিরাম রঘুবীরকে বুকে করে, ভাইদের সঙ্গে নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে নির্বিকার চিত্তে কামারপুকুরের পথে পা বাড়ালেন।

কামারপুকুরে আছে সুখলাল গোস্বামী। আপাতত সেখানেই চললেন ক্ষুদিরাম।

মনে জোর, বিপদভঞ্জন রঘুবীর আছেন ভয় কি? কে কাকে বিপদে ফেলতে পারে!

সবই তাঁর ইচ্ছে। তিনিই এ ব্যবস্থা করেছেন। রামানন্দ উপলক্ষ্য মাত্র।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন না, একটি অভিশাপ উচ্চারণ করলেন না।

চন্দ্রমণি বললেন, এই বেশ হলো। এখন আর চিন্তা নাই।

সৎএর ঘরে থাকব। অসৎকে পরিহার করব। রাবণের লঙ্কাপুরী বড় না রামের দণ্ডকারণ্য বড়?

সুখলাল গোস্বামী বললেন, আমার তো বেশি নাই। যা আছে তার কিছু নাও। ঘর বাঁধো, কামারপুকুরে থাক।

ক্ষুদিরাম ঘর বাঁধলেন কামারপুকুরে। দেবগ্রামের মাণিক চট্টোপাধ্যায়ের বংশ চলে এলো কামারপুকুরে।

আমি বড় অযত্নে আছি, একদিন স্বপ্ন দেখলেন ক্ষুদিরাম। রামচন্দ্র বালক বেশে এসে বলছেন। মুখটি বড় শুকনো। আমাকে তোর বাড়ীতে নিয়ে চল।

কিন্তু ঠাকুর!—আমি তোমাকে খাওয়াব কি? তোমার সেবার সাধ্য আমার যে নাই!

তুই আমাকে নিয়ে চল। যার ভক্তি আছে তার ত্রুটি নাই।

ঘুম ভেঙ্গে গেল ক্ষুদিরামের।

ভিনগাঁ থেকে ফিরতি পথে, গরমে ক্লান্ত হয়ে পথের মাঝে গাছের ছায়ায় ঘুমিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। উঠে বসলেন। চারদিকে তাকান। স্বপ্নটি যেন এখনও চোখে লেগে আছে।

সামনের ধানক্ষেতের দিকে ক্ষুদিরাম স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। ঐতো সে মাঠটি। যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন রঘুবীর।

—ঐ যে সে গাছটি, সেই পাথরটি। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্ষুদিরাম।

এক পা এক পা করে এগিয়ে গেলেন।

একটুকরো পাথর পড়ে আছে তিনটি আল যেখানে মিশে ত্রিভুজ সৃষ্টি করেছে। তার উপরে ফণা ধরে আছে বিষধর। দুপুর রৌদ্রে সেথা যেন কেউ ছাতা মেলে ধরেছে।

ক্ষুদিরামকে দেখে ফণা গুটিয়ে বিষধর সরে গেল। ক্ষুদিরাম দেখলেন পাথরটি সামান্য পাথর নয়। শালগ্রাম শীলা। শাস্ত্রের লক্ষণগুলি মনে পড়ল। মিলিয়ে দেখলেন, রঘুবীর শীলা।

ভক্তিভরে মাথায় তুলে নিলেন ক্ষুদিরাম।

প্রভু তুমি এসেছ! স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমার ঘরে যেতে চেয়েছ। চল—!

মেদিনীপুর যাচ্ছেন ক্ষুদিরাম। গাড়ি ঘোড়া নয় পায়ে হেঁটে। বৈষয়িক কাজ, যেতেই হবে। নাহলে ক্ষতির সীমা থাকবে না।

হেঁটে চললেন ক্ষুদিরাম, জোরে জোরে।

ফাল্গুনমাস, গাছের ডালে ডালে কিশলয়ের মেলা। বেল গাছেও নতুন পাতা।

ক্ষুদিরাম দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাঠৎ যেন কেউ তার চলন্ত পা দুটি চেপে ধরল। চোখ পড়েছে রাস্তার পাশে বেল গাছের উপর। দুপুরের রোদে কচিবেল পাতাগুলি একটু নুইয়ে গেছে কিন্তু কি সুন্দর। চোখ যে রাখা যায় না। বড় বড় কচি কচি সবুজ রংয়ের পাতাগুলি মাঝে মাঝে বাতাসে নড়ে উঠছে। যেন হাতছানি দিয়ে ক্ষুদিরামকে ডাকছে।

কোথায় রইল মেদিনীপুর আর কোথায় গেল বৈষয়িক চিন্তা। ক্ষুদিরাম কোঁচড় ভরে বেলপাতা নিলেন। ফিরে এলেন আবার ত্রিশ চল্লিশ মাইল পাড়ি দিয়ে কামারপুকুরে। এমন পাতা দিয়ে দেব সেবা না করতে পারলে জীবনই বৃথা!

মেদিনীপুর গেলে না? চন্দ্রমণি প্রশ্ন করলেন।

এই দেখ—কোঁচড় খুলে বেলপাতা দেখালেন ক্ষুদিরাম।

বেলপাতা দেখে চন্দ্রমণিও খুশি।

ওমা! কি সুন্দর!—এ দিয়ে মনের আনন্দে পূজো করা যাবে। তাই না গো?

হাঁ।

বেশ করেছ, ফিরে এসেছ। চন্দ্রমণি বেলপাতা গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললেন,—মেদিনীপুর আর যাবে কোথায়! কিন্তু বেলপাতা থাকত না।

ক্ষুদিরাম গেছেন সেতুবন্ধ রামেশ্বর। ফিরে এলেন পায়ে হেঁটে। সঙ্গে আনলেন বামলিঙ্গ শিব।

এমনি করে সংসার চলে ক্ষুদিরামের। ভক্তের সংসার। সুখেও ভগবান দুঃখেও ভগবান। অনুযোগ নাই অভিযোগ নাই। দুঃখকে ধরে দান, দৈন্যকে ধরে আশীর্বাদ। বলে ভগবান অনেক দিয়েছেন। আর কত দেবেন? আমিই শুধু একা! তিনি বিশ্বচরাচরের পালন কর্তা। যার যা প্রাপ্য তিনি হিসাব মিটিয়ে দেন।

ছেলে রামকুমার বড় হয়েছে।

বাপকে যজমান বাড়ি যেতে দেয় না। বলে আমি বড় হয়েছি। বাবার কাছে পূজা-আর্চ্চা শিখেছি, এখন থেকে আমি যাব যজমান বাড়ি। বাবাকে যেতে হবে না।

ক্ষুদিরাম বললেন,—আচ্ছা।

ভুরসুবো গেছে রামকুমার। রাত হয়েছে তবু এখনও ছেলে ফিরে আসছে না দেখে চন্দ্রমণি ঘর বার করছেন। অস্থির হয়ে পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু একটু করে রাত কম হয়নি। শুক্ল পক্ষের রাত, চারদিক দিনের আলোর মত পরিষ্কার। চন্দ্রমণি দেখলেন, অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে এক গা গয়না গায়ে পথ দিয়ে

আসছে। কাদের মেয়ে গা! সোমত্ত বয়েস, এই রূপ, এক গা গয়না গায়ে রাতে একা পথে বেরিয়েছে!

চন্দ্রমণি জিজ্ঞাসা করলেন,—কোত্থেকে আসছ মা?

ভুরস্নুরো।

আমার ছেলেকে দেখেছ?—না না, তুমি তাকে চিনবে কি করে!

মেয়েটি বলল,—ভয় নাই, আপনার ছেলে একটু পরেই ফিরবে।

চন্দ্রমণি বললেন,—মা, এই একগা গয়না পরে, রাতের বেলা একা তুমি কোথায় চলেছ? দিনকাল ভাল নয়। বিপদ হতে কতক্ষণ! তুমি আমাদের ঘরে এসো। ভোরে উঠে চলে যেয়ো।

মেয়েটি বলল,—এখন নয় মা, আপনার বাড়িতে আমাকে আসতে হবে। এখন নয় পরে।

মেয়েটি চলে গেল।

বাড়ির পাশেই লাহা বাবুদের ধানের গোলা। সেদিকে গেল মেয়েটি।

ক্ষুদিরাম শুনে বললেন,—তুমি লক্ষ্মীদেবীকে দেখেছ। নিজে মুখে যখন আসবেন বলে গেছেন, তখন সময় হলেই আসবেন।

মেয়ে কাত্যায়ণীর বিয়ে হয়েছে আনুড়ে।

খবর এসেছে কাত্যায়ণী অসুস্থ।

ক্ষুদিরাম গেলেন আনুড়ে।...

মেয়ের হাব ভাব যেন কেমন!

ধ্যানে বসলেন ক্ষুদিরাম।—দেখলেন প্রেতযোনী ভর করেছে মেয়ের উপর।

আমার মেয়েকে কষ্ট দিচ্ছ কেন?

গয়ায় যদি পিণ্ড দাও, তোমার মেয়েকে আমি ছেড়ে দিতে পারি।

দেব। ক্ষুদিরাম বললেন, প্রমাণ রেখে যাও।

নিম গাছের মোটা ডালটা, ঝড় নাই বাদল নাই মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়ল।

ক্ষুদিরাম গয়ায় গেলেন। কথা দিয়েছেন প্রেতযোনীকে। মিথ্যেবাদী হতে পারেন না তো। তাহলে আর দেবগ্রাম ছেড়ে কামারপুকুরে কেন?

যত্ন করে পিণ্ডদান করলেন ক্ষুদিরাম। প্রেতযোনী মুক্ত হলো।

রাত্রিতে স্বপ্ন দেখলেন, গদাধরের জ্যোতির্ময় মূর্তি। শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ গদাধর এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন।

আমি তোর পুত্র হয়ে জন্মাব।

আমি গরীব তোমার উপযুক্ত সেবা করব কি করে?

সেবা থেকে ভক্তি বড়। ভক্তিতেই আমার তৃপ্তি।

কামারপুকুরে চন্দ্রমণিরও দিব্যদর্শন হচ্ছে।

একদিন দেখলেন বিছানার পাশেই যেন কে শুয়ে আছে। ধড়ফড় করে উঠে বসলেন চন্দ্রমণি—মাগো। কি লজ্জার কথা কিন্তু কেউ নেই। ঘরের খিল তেমনি বন্ধ, তেমনি বন্ধ দরজাটি।

যুগীদের শিব-মন্দিরে গেছেন চন্দ্রমণি। মহাদেবের দেহ থেকে আলোর শিখা এসে চন্দ্রমণিকে ছেয়ে ফেলল।

গয়া থেকে ফিরে এলেন ক্ষুদিরাম। স্ত্রীর কাছে শুনলেন সব।

চন্দ্রমণি বললেন, আমার মনে হচ্ছে কেউ যেন আমার পেটে এসেছে।

ক্ষুদিরাম বললেন, গদাধর আসছেন।

চন্দ্রমণি কখন কাঁদেন কখন ত্রাসে কেঁপে ওঠেন, কখন আনন্দে ডগমগ, কখন গভীর ঔদাসিন্য।—কখনো বলেন, আমার এ গর্ভ পতিস্পর্শে হয় নি। কখনো বলেন, পুরুষোত্তম আসছে আমার গর্ভে। কখনো হঠাৎ কেঁদে ওঠেন, আমাকে বুঝি গোঁসাইয়ে পেল।

গোঁসইয়ে পাওয়া মানে ভূতে পাওয়া।

সুখলাল গোস্বামী মারা গেছেন। তারপর থেকে কামারপুকুরে নানা উৎপাত সুরু হয়েছে। লোকে বলে, গোঁসাই মুক্তি পায়নি। তাই গাঁয়ের বেলগাছে বেলগাছে ঘুরে বেড়ায়।—

তাই কিছু হলে লোকেরা বলে, গোঁসাইয়ে পেয়েছে।

ক্ষুদিরাম মনটি খাঁটি রেখেছেন। জানেন চন্দ্রমণির কোলে কে আসছেন।

একদিন বদ্ধঘরে শুয়ে আছেন চন্দ্রমণি, শুনলেন ঘরের মধ্যে রুণুঝুনু রুণুঝুনু নুপুরের শব্দ। নাক ভরে পেলেন চন্দনের সুগন্ধ।

চন্দ্রমণি উঠে বসলেন, নাঃ ঘরে কেউ নাই। দরজাও খিল আঁটা।

ক্ষুদিরাম শুনে বললেন, কাউকে বলোনা একথা। গোকুলচন্দ্র আসছেন আমাদের ঘরে।

আর একদিন চন্দ্রমণির মনে হলো, কে যেন কচি হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করছে। বুকের উপরে শিশুদেহের নরম স্পর্শ।

চন্দ্রমণির কোল আলো করে চতুর্ভুজ গদাধর দ্বিভূজ হয়ে।

১২৪১ সলের ৬ই ফাল্গুন, ইংরাজি ১৮৬৩ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি, শুক্লপক্ষের রাত শেষ হয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে ব্রহ্মমুহূর্ত। আকাশে তারার সংখ্যাও একটি দুটি করে শেষ হয়ে এসেছে। শাঁখ বেজে উঠল কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের বাড়িতে। তিনবার নয় পাঁচবার। মেয়েরা উলুধ্বনি করলেন। রাতের কালো আকাশে তখন ব্রহ্মমুহূর্তে ঊষার আলো ফুটতে সুরু করেছে। সময়টি দেখ সন্ধ্যা নয় ঊষা। নবদিগন্তের আলোর ঝলকানি। আর একটু পরেই দিবাকরের সাতরঙের রথের চূড়ো দেখা যাবে। অরুণ সারথি বল্গা ধরে ছুটিয়ে আনবে দিবাকরের রথ আকাশের নীল পথটি ধরে।

ছেলে পাশে নিয়ে শুয়ে আছেন চন্দ্রমণি। ধাই ধনী বসে আছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে ধনী, ছেলে কই ?

চন্দ্রমণি কেঁদে উঠলেন, কোথায় গেল ছেলে ? শেয়ালে টেনে নেয় নি তো ?

ধনী বলে, আমি বসে আছি, শেয়াল আসবে কি গো।

তবে ছেলে কই ?

ঘরে ছিল ধানসেদ্ধ-করা উনুন। আগুন নাই উনুন ভরা ছাই। এক গা ছাই মেখে ছেলে শুয়ে আছে ছাইয়ের গাদায়।

ভূমিষ্ঠ হয়েই বৈরাগ্য। জন্মক্ষণেই গায়ে মাখলেন বিভূতি। তাই আর গায়ে ছাই মাখেন নি ঠাকুর।

সবাই শুনে অবাক হয়। অবাক হন না ক্ষুদিরাম। জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে মনে মনে বললেন, প্রভু তাহলে সত্যিই তুমি এলে।

নাহলে এমন অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে কেন ? এতো আর তোমার আমার জীবনে ঘটে না।

ছেলেকে নিয়ে বসে আছেন চন্দ্রমণি। হঠাৎ ছেলে যেন পাহাড়ের মত ভার হয়ে উঠল।—

তাড়াতাড়ি কুলোর উপরে নামিয়ে রাখলেন ছেলেকে। কুলো চড়চড় করে উঠল।

বিশ্বম্ভরকে বহন করা কি সহজ কথা, যদি না তিনি নিজের ভার নিজে সম্বরণ করেন।

কেঁদে উঠলেন চন্দ্রমণি।

ধনী ছুটে এলো, সর আমি দেখছি।

কি খেয়াল হলো ধনী নারায়ণ নারায়ণ বলে তুলসী পাতা রাখল ছেলের মাথায়।

কোথায় ভার কোথায় কি !—হাসতে হাসতে ধনী কোলে তুলে নিল ছেলে।

সংসারের কাজ সেরে পাঁচ মাসের কচি বাচ্চা নিয়ে শুয়ে আছেন চন্দ্রমণি।

হঠাৎ দেখেন এক বিরাটকায় পুরুষ শুয়ে আছে ছেলের জায়গায়। চন্দ্রমণি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।

ছুটে এলো ক্ষুদিরাম।—

দেখ, দেখ বিছানায় কে শুয়ে আছে।

কই গো! ক্ষুদিরাম বিছানার দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার ছেলে তো দিব্যি শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আর কাউকে এসব কথা বলো না। আর অলৌকিক দর্শন হলে ভয় পেয়ো না। নারায়ণ নারায়ণ বলে ছেলের মাথায় হাত রেখো। গদাধর এসেছেন আমাদের ঘরে।

ছেলের ডাকনাম হলো গদাধর।

মুখে ভাত হবে।

পাড়ার লোক এসে ধরল, পাড়াশুদ্ধ নিমন্ত্রণ করতে হবে।

নারদের নিমন্ত্রণ!

ধর্মদাস লাহা ক্ষুদিরামের বন্ধু। নারদের নিমন্ত্রণটি তিনিই করেছেন। আড়াল থেকে পাড়ার লোকের মাথায় মতলব জুটিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে আছেন।

ক্ষুদিরাম বিপাকে পড়লেন।

পাড়াটি তো নেহাৎ ছোট নয়। বলতে হলে সবাইকে বলতে হয়। সবাই ক্ষুদিরামের আপনজন। তার উপরে আছে আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুরা। পাড়ার লোক সব আবদার ধরেছে; না রাখলেও মন ভার হয়, মান থাকে না। দুঃখের ভাগ যেমন নিয়ে যায়, সুখের ভাগই বা নেবে না কেন।

ক্ষুদিরাম গেলেন ধর্মদাসের কাছে।

এখন কি করি বল?

কি আর করবে, সবাইকে বল। বলা তোমার উচিত।

উচিত তো বটে, কিন্তু আমার সামর্থ্যের বাইরে। ইচ্ছে করে, সাধ্যে কুলায় না।

ধর্মদাস মুচকি হাসেন।

লেগে যাও ভাই—ভগবান আছেন, তাঁরটা তিনিই করে নেবেন। তুমি আমি কে?

ভগবান সহায় হলে কিছুই আটকায় না।

ভগবানের উপর নির্ভরশীল ক্ষুদিরাম লজ্জা পেলেন। তাইত! এত ভাবনা কিসের! আমি কে? যারটা তিনিই করবেন। সবই তাঁর ইচ্ছা।

বললেন,—ভাই তাই হবে। তুমি ঠিক কথা বলেছ। আমি কে?

ধর্মদাসই সব ব্যবস্থা করলেন।

গদাধরের নাম হলো রামকৃষ্ণ। রামকুমার, রামেশ্বর, রামকৃষ্ণ। দুই মেয়ে কাত্যায়ণী, সর্বমঙ্গলা।

লাহাবাবুদের অতিথিশালা।

সাধু সন্ন্যাসীর আস্তানা। গদাই সেখানেই পড়ে থাকে। সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই যেয়ে কাছে বসে। সাধু সন্ন্যাসীরাই গদাইয়ের আপনজন।

চন্দ্রমণি ছেলেকে নতুন কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন। গদাই গেছে লাহা বাবুদের অতিথিশালায়। কিছুক্ষণ পর ছেলে ফিরে এলো। ছেলেকে দেখে চন্দ্রমণি অবাক। নতুন কাপড় ছিঁড়ে কৌপীন করে পরে এসেছে।

একি করেছিস নতুন কাপড়টাকে?

ক্ষুদিরাম ছিলেন কাছে। বললেন,—কিছু বলো না। গদাইয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম কপালে জোড় হাত ঠেকালেন।

গদাধর পাঁচ বছরে পা দিয়েছে।

চন্দ্রমণি বললেন,—ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাও। বামুন পণ্ডিতের ছেলে লেখাপড়া শিখতে হবে।

ক্ষুদিরাম গদাইকে ভর্তি করে দিলেন লাহা বাবুদের নাটমন্দিরে

মশাইয়ের পাঠশালায়। তালপাতার চ্যাটাই বিছিয়ে পড়ুয়ারা বসে। গদাই ভর্তি হলো সেখানে। এসব ভাল লাগে না গদাইএর। মন পড়ে থাকে সাধু সন্ন্যাসীর কাছে, অতিথিশালায়।

অনেক কষ্টে বর্ণ পরিচয় হলো গদাইএর।

মশাই বললেন,—চাটুজ্জে মশাই, আপনার ছেলের বিদ্যাশিক্ষায় মন নাই।

সর্ববিদ্যার অধিকারী যিনি, তাকে মশাই বুঝাবেন কি করে!

ক্ষুদিরাম বললেন,—যা শেখে!

মশাই অবাক হল। চাটুজ্জে মশাই এত বড় পণ্ডিত, আর ছেলের বেলায় এই! ভেবেছিলেন চাটুজ্জে মশাই ছেলের বিদ্যায় অনাদর শুনে নিরাশ হবেন। ছেলের পিঠে দু'একঘা খড়ম দিয়ে, মশাইকে বেত চালাবার ঢালাও হুকুম দেবেন!—না একেবারে নিরাসক্ত—বলে যা শেখে! এমন কথা মশাই কখনও শোনেন নি। অভিভাবকরা বরং উল্টো কথাই বলেন। বলেন, মশাই তবে আপনার বেতটি আছে কি করতে।

অনেক কষ্টে বর্ণ পরিচয় হলো গদাধরের। কিন্তু শুভঙ্করীর নাম শুনলেই গায়ে জ্বর আসে, মুখ শুকিয়ে যায়।

ত্রিভুবনের শুভঙ্কর শিখবেন শুভঙ্করী!

মধু যুগীর বাড়ীতে বসে গদাই প্রহ্লাদ চরিত্র পড়ছে। সবাই শুনছে একমনে। কাছেই আমগাছে একটা হনুমান বসেছিল। পাঠ সাঙ্গ হলে নীচে নেমে এসে গদাইএর পা চেপে ধরল।

সবাই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। দিল বুঝি গদাইকে কামড়ে।

গদাই হনুমানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

গদাই সাথীদের নিয়ে মাথুর বিরহ পালা খেলছে। কেমন আবিষ্টের মত হয়ে পড়ল গদাই। ছেলেরা ভয় পেল।

একটি ছোট ছেলে এগিয়ে গিয়ে গদাইএর কানের কাছে কৃষ্ণনাম বলতে জ্ঞান ফিরে এলো গদাইএর।

রামশীলার উপরে শীতলা দেবীর ভর হয়েছে। সবাই ভয় পায়। কি করবে কিছু ভেবে পায় না। গদাধর নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাছে, খুঁটিয়ে দেখছে পিসিকে। তারপর বলল,—আমার যদি পিসির মত হয় বেশ হয়।

ক্ষুদিরাম মারা গেলেন। গদাইএর বয়স তখন সাত।

আট বছরে পা দিলে গদাইএর পৈতে হবে।

গদাই গোঁ ধরেছে ধাই মার হাতে ভিক্ষে নেবে।

সে কি! ধনী তো আর ব্রাহ্মণ নয়। নব ব্রহ্মচারী ভিক্ষে নেবে ব্রাহ্মণের কাছে। শাস্ত্রের আচার।

গদাই বলল,—ওসব কিছু শুনছি না, আমি ধাইমার হাত থেকে ভিক্ষে নেব।

নেবে বইকি! নিতেই যে এসেছেন। যাকে পেতে বেদপুরাণ, তিনি কি বেদপুরাণের বাঁধন মানেন? তিনি যে পাশমুক্ত। আচার কার জন্য? পাশ বদ্ধজীবের জন্য।

গদাই ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে রইল। তোমরা কথা দাও, তবে দরজা খুলব। না হলে খুলব না।

সারাদিন কেটে গেল। মা ডাকেন, দাদারা ডাকেন, গদাইএর এক কথা। ধাইমার হাতে ভিক্ষে নেব।

রামকুমার পণ্ডিত লোক। কিন্তু অনুস্বার বিসর্গের অভিমান নাই। কানে গেল গদাইএর কথা। বললেন,—গদাই তুমি দরজা খোল, আমি কথা দিচ্ছি। তুমি ধাইমার কাছ থেকে ভিক্ষে নিও।

মন খুঁতখুঁত করলেও, সবাই বলল,—তাই হবে।

কোন বাঁধনেই যাকে বাঁধতে পারেনি, তাঁকে বাঁধার চেষ্টা মানে জলে দাগ কাটা।

রামকুমার বললেন,—গদাইএর মন যখন চাইছে, তখন এতে পাপ নাই।

ধর্মদাস লাহার মেয়ে যাচ্ছে বিশালাক্ষী মন্দিরে পূজো দেবে।

সঙ্গে আছে গদাই। গাঁয়ের বাইরে ফাঁকা মাঠে এসে সবাই গান ধরল—বিশালক্ষ্মীর স্তব। গদাই দাঁড়িয়ে পড়ল স্তব্ধ হয়ে। কোন্ জগতে চলে গেছে গদাইএর মন, বাহ্যজ্ঞান নাই। মেয়েরা ভয় পেল। ধর্ম্মদাস লাহার মেয়ে প্রসন্ন বলল,—ভর হয়েছে! কানে দেবীর নাম শোনালে কেটে যাবে।

দেব দেবীর নাম কানে গেলেই, গদাধর তন্ময় হয়ে যায়।

চন্দ্রমণি আগে ভয় পেতেন। ভাবতেন ছেলেকে বুঝি গোঁসাইজী পায়। এখন আর ভয় পান না।

দাদারা ভাবে বায়ু রোগ।

রামকুমার ভাইকে কলকাতায় নিয়ে এলেন।

রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে নবরত্ন কালী প্রতিষ্ঠা করেছেন। পূজারী নাই। কৈবর্ত্তের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। সেখানে ব্রাহ্মণ কাজ করবে কি করে। শেষে কি কৈবর্ত্তের বামুন হবে। ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো।

রামকুমার পণ্ডিত মানুষ। টোলের অধ্যাপক। অন্ধ আচারের পক্ষপাতি নয়। বিচার করে বিশ্লেষণ করে কাজ করেন।

বললেন,—সে কি কথা! দেব দেবীর আবার বামুন কৈবর্ত্ত কি? মন্দিরের আবার জাত কি? বামুনের স্থাপিত মন্দিরে যদি কৈবর্ত্ত প্রণামী পাঠায়, তাহলে গ্রহণ করতে নিষেধ আছে কি? আমি পূজো করব। রাসমণিকে বললেন,—গোলমালে কাজ নাই, আপনি মন্দির কোন ব্রাহ্মণের নামে উৎসর্গ করে দিন।

গদাই বলল,—দাদা তুমি একি করছ? বাবা কোনদিন শূদ্রের যাজন করেন নি।

একদিন মথুরবাবু দেখলেন গদাইকে।

ছেলেটি কে?

আমার ভাই।

এ মন্দিরে কাজ করবে আপনার ভাই?

দেখব জিজ্ঞাসা করে।

মথুরবাবুর লোক এলো গদাধরের কাছে।

বাবু ডাকছেন।

হৃদয় ছিল কাছে দাঁড়িয়ে। বলল, যাও না, যেয়ে দেখই না কি বলেন। ভয় কি? বাঘ ভাল্লুক নয় যে হালুম করে গিলে ফেলবে।

গদাধর বলল, খুব বুঝেছিস। গেলেই বলবেন এখানে থাকো, চাকরি কর।

ওসব বাবা আমি পারবনি।

হৃদয় বলল, দোষ কি, বাবুর মত ভাল লোক আর আছে? এখানে কাজ করা তো ভাল।

চাকরি নিলেই বাঁধা পড়ব।—তা ছাড়া দেবীর গায়ে কত গয়না দেখছিস তো, ভার নেবে কে?

আমি!

সত্যি? গদাধর খুশি হলো। হৃদে খুব শক্ত লোক। চারদিকে নজর রাখে। হৃদে সঙ্গে থাকলে অত ভয় নাই। বলল, সত্যি বলছিস? আচ্ছা তাহলে তুইও আমার সঙ্গে চল।

ঠিক হলো ঠাকুর হবেন দেবীর বেশকারী আর হৃদয় হবে সাকরেদ?

॥ দশ ॥

রথে তুলতে বিগ্রহ নিয়ে পিছলে পড়ে গেল পূজারী। আষাঢ় মাস, বৃষ্টি আর জল কাদায় পথ-ঘাট পিছল হয়ে আছে। পড়ে গিয়ে বিগ্রহের পা ভেঙ্গে গেল। রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ।

সবাই বলল, এমূর্তি বিসর্জন দিতে হবে। মূর্তির খুঁৎ হয়েছে।

রাসমণির মন খুঁত খুঁত করে। এতদিনের বিগ্রহ মায়া পড়ে গেছে। কিন্তু সবাই এক কথা বলে, বিগ্রহের খুঁৎ হলে রাখতে নাই। বিসর্জন দিতে হয়।

গদাধর বলল রাণীর জামাইয়ের যদি ঠ্যাং ভেঙ্গে যায় তবে রাণী জামাইকে বিসর্জন দেবেন?

পণ্ডিতেরা সে কথা শুনে বলে উঠলেন, মূর্খ কি আর গাছে ধরে। জামাই আর বিগ্রহ এক হলো। শাস্ত্রবাক্য তাহলে মিথ্যা?

গদাধর বলল, বিগ্রহ আর সন্তানে প্রভেদ নাই। তোমার বাড়ির বিগ্রহটিকে কি তুমি সন্তানের মত রক্ষা কর না। সন্তানকে অভুক্ত রেখে তুমি খেতে পার? বিগ্রহকে অভুক্ত রেখে তুমি খেতে পার?

রাণী গদাধরের উপরে ভার দিলেন।

গদাধর বিগ্রহের ভাঙ্গা পাটি এমন ভাবে সারিয়ে দিল যে কেউ বুঝল না কোথায় পা'টি ভেঙ্গেছিল।

জয়নারায়ণ বাড়ুজ্জে গদাধরকে বললেন, আপনাদের বিগ্রহের নাকি পা ভাঙ্গা?

তোমার কি বুদ্ধি গো!—গদাধর বলল, যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার, তিনি ভাঙবেন কি করে?

রামকুমার খুশি হয়েছেন। মন্দিরের কাজে গদাধরের মন বসেছে।

গদাধরের কিন্তু রোজগারে মন নাই। টাকা ছুঁলেই হাত বেঁকে যায়।

ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল গদাধর, হ্যাঁ গো, টাকা ছুঁলেই আমার হাত বেঁকে যায় কেন বল দেখি।

বলে কি! ডাক্তার পরীক্ষা করবার জন্য আড়াল করে একটি টাকা গদাধরের হাতে ছোঁয়ালেন।

গদাধরের হাত বেঁকে গেল।—

গদাধর টাকা ছোঁয় না। হৃদয় সে দিক সামলে নেয়।

রামকুমারের বয়স হয়েছে। কালী মন্দিরে পূজো করতে কষ্ট হয়। গদাধরকে বললেন, গদাই তুই কালী মন্দিরে আয়, আমি রাধাগোবিন্দের মন্দিরে যাই।

কেনারাম ভট্টাচার্য গদাধরকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

রাতে গদাই ঘরে থাকে না। সকালে যখন ফেরে তখন কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত।

হৃদয় ভাবল, এর পিছনে রহস্য আছে। মামা রাতে যায় কোথায় দেখতে হবে।

রাত গভীর হতেই গদাধর উঠে পড়ল। হৃদয় ঘুমাইনি। শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করছে। আজ মামার রহস্যটি বার করতে হবে।

হৃদয়ও চুপি চুপি মামার অনুসরণ করল।

পঞ্চবটি বনে ঢুকতে দেখে হৃদয় দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর ভিতরে রাতে তো দূরের কথা দিনেও যাবার সাহস হৃদয়ের নাই।

অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, আমলকী আর অশোক এই পাঁচটি গাছ মিলে পঞ্চবটি।

মামাকে পঞ্চবটিতে ঢুকতে দেখে হৃদয় ভাবল, মামাকে নিশ্চয় ভূতে পেয়েছে। না হলে এত যায়গা থাকতে এই ভূতের আড্ডায় কেন?

হৃদয় ঢিল কুড়িয়ে নিল। ঢিল ছুঁড়লে যদি মামা ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে। কিন্তু হৃদয়ই ভর পেয়ে পালিয়ে এলো।

পূজোয় মন নাই গদাধরের। কখন কাঁদে, কখন চুপ করে বসে থাকে। আবার কখন বা দেবীর পায়ে না দিয়ে নিজের মাথায়ই ফুল দিয়ে রাখে।

বিড়বিড় করে বলে, কথা শুনবি না?

অভিমানে দেবীর খাঁড়াটি তুলে নিল গদাই।—যখন তুই কথা শুনিস না, আমি আর প্রাণ রাখব না।

হাত চেপে ধরলেন ভবতারিণী।

গদাইএর অভিমান যায় না, বলে—ছেড়ে দে। আজ দেখা দিয়ে, আবার তো গা ঢাকা দিবি?

না, তুই যখনই ডাকবি, আমি আসব।

খুশি হয়ে গদাই বিগ্রহের হাতে খাঁড়া রেখে দিল।

গভীর রাতে নূপুরের শব্দ হচ্ছে। কান পাতে গদাধর। মন্দিরের দিকে ছুটে যায়।

বিগ্রহ বেদীতে নাই। ভবতারিণী বসে আছেন নীচে। গদাই নাকের নীচে হাত রাখল নিঃশ্বাস পড়ছে।

ভবতারিণী ভোগের থালায় দিকে হাত বাড়ালেন।

চেঁচিয়ে উঠল গদাই, দাঁড়া, আগে মন্তরটা বলে নেই, তার পর খাবি।

চীৎকার শুনে ছুটে এলো হৃদয়।

মামা, একি করছ? জল বেলপাতা নিবেদন না করে নৈবেদ্যের থালা দিচ্ছ কেন?

দেখনা! রাক্ষসীর যে তর সইছে না।

নৈবেদ্যের থালা থেকে এক মুঠো তুলে নিয়ে বিগ্রহের মুখে দিয়ে গদাই বলল, খাবো কি বলছিস ? আমি খাব। আচ্ছা !

হৃদয় অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একি করছে মামা, নিজে খেয়ে দেবীর মুখে দিচ্ছে।—একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে।

নরেনও একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, মা মা যে করেন, তাঁকে আপনি দেখতে পান ?

দেখতে পাই কি রে !—যেমন তোকে দেখছি তেমন দেখি। মায়ের সঙ্গে খাই পর্যন্ত—

নরেন ঠাট্টা করে বলেছিল, মশায় একেবারে বদ্ধ উন্মাদ !

প্রতাপ হাজরা দক্ষিণেশ্বরে আড্ডা গেড়েছে।

গদাধর বলে, হাজরাশালার পেটে পাটোয়ারি বুদ্ধি।—

নরেনের কিন্তু হাজরাকে অপছন্দ নয়। মাঝে মাঝে এসে হাজরার কাছে বসে।

হাজরা তামাক সাজছে। নরেন হুঁকো নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—একেবারে বদ্ধ পাগল। যত সব অসম্ভব কথা বলে।

কি বলে।

বলে ঘটি, বাটি, থালা, গ্লাস সবই নাকি ঈশ্বর। এমন কি আমরাও।

তাই বুঝি ? হাজরা হেসে উঠল। পাগল আর কাকে বলে।

ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন, কি হয়েছে রে নরেন ?

নরেনের কি হলো, সব কিছুই, যে দিকে তাকায় ঈশ্বরময়।

ভাতের থালা নিয়ে বসল। চুপ করে বসে আছে।

মা বললেন, ওকি খা। চুপ করে বসে আছিস কেন ?

নরেনের মনে প্রশ্ন জাগে, কে খাচ্ছে, কাকে খাচ্ছে ?

কেশব সেন আর বিজয় গোস্বামীর মনান্তর হয়েছে।

ঠাকুর বললেন, তোমাদের ঝগড়া শিব রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হলো দুজনে ভাবও হল। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেত আর রামের বানরগুলোর কিচিমিচি ঝগড়া আর মেটে না।

মহিমচরণকে দেখে বলে উঠলেন, কি গো! এখানে যে জাহাজ এলো?

বিদ্যাসাগরকেও এ কথা বলেছিলেন।

আমরা জেলে ডিঙি। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু জাহাজ। চড়ায় আটকে যাবে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন, তুমি আবার কার ভারে বাঁকা গো!

আর মশায়!—বঙ্কিম বললেন, সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

মহেন্দ্র সরকারকে বললেন, বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চায় নি। বলেছিল রাম, তোমাকে পেয়েছি, আর রাজা হয়ে কি হবে? রাম বললেন, বিভীষণ তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হও। যারা বলছে তুমি রামের এত সেবা করলে, তোমার কি হলো? তাদের শিক্ষার জন্য রাজা হও।

বৈঠকখানা ঘরে ভক্তেরা গাইছে।—

ঠাকুর এসে বললেন, তোমরা গাইছ, ভাল হবে না কেন? শোন, 'নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলাম। রাতদিন ভীড়। আমি পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতীর ঘরে বসতাম। খানিক পরে সেখানে সব উপস্থিত। খোল করতাল নিয়ে গেছে। আর তাকুটি তাকুটি করছে। রব উঠে গেল, সাতবার মরে সাতবার বাঁচে এমন লোক এসেছে। পাছে সর্দ্দি-গর্ম্মি হয়, হৃদে টেনে নিয়ে যায় মাঠে। সেখানে আবার পিঁপড়ের সার। আবার খোল করতাল আর তাকুটি তাকুটি। সেখানকার গোঁসাইরা এলো ঝগড়া করতে। ভাবল আমরা বুঝি তাদের পাওনা গণ্ডায় হাত দিতে এসেছি। দেখলে আমি একখানা কাপড় কি গামছাও নেইনি। কে বলেছিল ব্রহ্মজ্ঞানী। তাই গোঁসাইরা দেখতে

এসেছিল। একজন জিজ্ঞেস করল, মালা তিলক কই? তাদেরই একজন বলল, নারকেলের বোল্লা আপনা আপনি খসে গেছে।

মথুরবাবুর কাছে সংবাদ গেল।

গদাধরের অনাচারে মন্দির ভরে গেছে। ছোট ভট্‌চার্য একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। মথুরবাবু বললেন, রাণীকে।

রাসমণির মন সায় দিল না। ছোট ভট্‌চার্য সাধারণ মানুষ নয়। যা হোক নিজের চোখে দেখতে হবে।

রাসমণি এলেন দক্ষিণেশ্বরে। এসেই বললেন. গান শোনান।

গান ধরেছে গদাধর। রাণী শুনছেন। হঠাৎ গান থামিয়ে রাণীকে এক চড় বসিয়ে দিল গদাধর।

এখানেও চিন্তা।

রাণী প্রথমটা একটু চমকে উঠলেন। একটি কঠিন মামলার কথা চিন্তা করছিলেন। রাণী গদাধরের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে মন্দির ছেড়ে চলে এলেন।

খাজাঞ্চি গোমস্তারা মথুববাবুর কাছে ছিল।

হৃদয় ভয় পেয়ে ছুটে এলো।

মামা তুমি এ কি করেছ?

গদাধর বলল, কি জানি, মা যে বললো এখানে বসেও সম্পত্তির চিন্তা করে যে তাকে এক ঘা বসিয়ে দে।

মথুরবাবুকে ডেকে পাঠালেন রাণী।

বললেন, ভট্‌চার্য ঠিক করেছে। ওঁর হাত দিয়ে মা ভবতারিণী আমাকে শাসন করলেন। সত্যি আমি তখন বিষয়চিন্তা করছিলাম। ভট্‌চার্যকে কিছু বলো না।

গদাধরের পাগলামি দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

মথুরবাবু পর্যন্ত বিচলিত। কলকাতার সেরা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে দিলেন চিকিৎসার ভার।

ঠাকুর বলতেন ধন্বন্তরী।

ধন্বন্তরীর চিকিৎসায়ও কোন কাজ হলো না।

মথুরবাবু বলেন, আপনার ভগবান এক ডালে দু'রঙের ফুল ফোটাতে পারেন?

ইংরাজি পড়েছেন মথুরনাথ। ভগবানে বিশ্বাসও নাই অবিশ্বাসও নাই। বলেন সবই নিয়মে চলে। নিয়মটাই ভগবান। লাল ফুলের গাছে, লাল ফুল ফুটবে সে গাছে সাদা ফুল ফোটে না।

ঠাকুর বললেন, বল কি গো! মায়ের ইচ্ছায় সবই হতে পারে।

তাই নাকি।—বেশ আপনার মা ফোটান দেখি লাল গাছে সাদা ফুল।

মাকে বলব। ঠাকুর বললেন, ইচ্ছা করলে পারেন বই কি। কাল এসো।

মথুরবাবু বাগানে এসে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এক ডালে দুটি ফুল ফুটে আছে, একটি লাল জবা, একটি সাদা জবা।

ঠাকুরের শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। মথুরবাবু ভাবলেন বোধ হয় ইন্দ্রিয়ের বিদ্রোহ এর কারণ। ফাঁদ পাতলেন। সহর থেকে পতিতা এনে রাত্তি হলে পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুরের ঘরে।

ঠাকুর মহাখুশি। মা, মা এসেছিস? আয় মা। প্রণাম করে লুটিয়ে পড়লেন ঠাকুর। পতিতা মেয়েটি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

ঠাকুরকে নিয়ে কলকাতায় এলেন মথুরবাবু। জুড়িগাড়ী হাঁকিয়ে থামলেন এসে মেছুয়াবাজারের একটি নামকরা পল্লীতে। বাড়ির দরজায় অনেকগুলি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল খদ্দেরের আশায়। মথুরবাবু ঠাকুরকে সেখানে রেখে আড়ালে সরে পড়লেন।

ঠাকুর মাতৃস্তব আরম্ভ করলেন। শিশুর মত সরল, বাহ্যজ্ঞান নাই।

মেয়েরা পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

বাবা আমাদের ক্ষমা কর। আমরা মহাপাপী।

গোলমাল শুনে মথুরবাবু উঁকি দিলেন।

মেয়ের দল ঝাঁজিয়ে উঠল আপনি কেমন লোক? আপনার কি কোন জ্ঞান নাই!

বাবাকে এই আঁস্তাকুড়ে নিয়ে এসেছেন?

মথুরবাবু লজ্জা পেলেন। গর্বও হলো। এমন লোক থাকে আমাদের আশ্রয়ে।

মথুরবাবু বললেন, আপনি যাকে তাকে মা ডাকেন কেন? ওটা ভাল নয়।

বল কি গো। ঠাকুর বললেন, আমি যে ওদের মধ্যে আমার মাকে দেখতে পেলাম।

পালাজ্বরে ভুগছেন ঠাকুর। আরাম হচ্ছে না। পঞ্চবটিতে ধ্যানে বসেছে! শরীর থেকে কে একজন বেরিয়ে এলো। নেশাখোরের মত টলে পড়ছে। আর একজন এল পিছু পিছু। গেরুয়া পরা, হাতে ত্রিশূল। ঢলে পড়া ছায়ার দিকে তেড়ে গেল।

নিরাময় হলেন ঠাকুর।

পানিহাটিতে গেছেন ঠাকুর। মহোৎসব হবে পানিহাটিতে। বৈষ্ণবচরণ পাঁচটি টাকা দিলেন ঠাকুরের হাতে। আম কিনে খেয়ো।

ঠাকুর টাকা ছুঁতে পারলেন না, হাত বেঁকে যায়। হৃদয় এগিয়ে গেল। মামাকে বিশ্বাস নাই। পাঁচটি টাকা হয়ত হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

বলল, আমার কাছে দিন।

ঠাকুরকে মাঝে বসিয়ে কীর্তন সুরু হলো। সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন ঠাকুর। গঙ্গার ধারে বসে এক হাতে টাকা নিয়ে এক

হাতে মাটি নিয়ে ঠাকুর বলল টাকা মাটি, মাটি টাকা। তারপর টাকা দুটোই গঙ্গায় ছুঁড়ে দেন।

রামতারক এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর ডাকেন হলধারী। বেদান্তে দখল আছে।

হলধারী মথুরবাবুর কাছে গেল।—

মথুরবাবু বললেন, বেশ হলো। ছোট ভট্‌চার্য নিজের খেয়ালে থাকেন, আপনি মায়ের পূজো করুন।

হলধারী বৈষ্ণব। কালীপূজো করতে হবে, বৈষ্ণব হয়ে। আবার তখনই ভেবে দেখল কালী আর কৃষ্ণ এক, শক্তিও যা মধুরতাও তা। কে কালী, কে কৃষ্ণ সবই তাঁর নানা রূপের প্রকাশ।

দ্বিধা কেটে গেল হলধারীর।

বলল, আচ্ছা।

হলধারী স্বপাকে খায়।

মথুরবাবু বললেন, আপনার ভাই রামকৃষ্ণ আর ভাগ্নেতো প্রসাদ পায়। আপনি স্বপাকে খান কেন? আপনিও তাই করুন।

হলধারী বললেন, আপনি কার সঙ্গে তুলনা করছেন। রামকৃষ্ণ এখন সাধনার উচ্চস্তরে।

তার বিচারের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে।

হলধারী পূজা করেন। মনে বোধ হয় একটু কিন্তু থাকে।

ভবতারিণী দেখা দিয়ে বললেন, তুই পূজো করিস না। অমঙ্গল হবে।

হলধারী ভাবলেন বুঝি চোখের ভুল। তেমনি পূজো করে যেতে লাগলেন।

দেশ থেকে খবর এলো, ছেলে মারা গেছে!

ঠাকুর বললেন, তুমি রাধাগোবিন্দের পূজো কর। হৃদয়কে দাও কালী পূজা করতে।

হলধারী গেলেন রাধাগোবিন্দের মন্দিরে। হৃদয় এলো ভব-তারিণীর মন্দিরে।

হলধারী বৈষ্ণব পণ্ডিত।

হলে কি হবে স্বভাবটি দুর্বাসার মত। একটুতেই রেগে উঠে, অভিশাপ দেয়।

বাকসিদ্ধ পুরুষ তাই সবাই ভয় পায়।

ঠাকুর শুনলেন একথা।

বললেন, ওসব অনাচার এখানে চলবে না। মায়ের মন্দিরে কাউকে শাপমন্যি করতে পারবে না।

হলধারীর মেজাজটি দপ্ করে জ্বলে উঠল।

তুই আমার ছোট হয়ে আমাকে শাসন করতে এসেছিস? তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, ঠাকুরের রক্তবমি হল। রক্ত থামে না। এক সাধু ছিলেন তখন দক্ষিণেশ্বরের অতিথিশালায়, শুনে প্রশ্ন করলেন ঠাকুরকে।—

হঠযোগ কর?

হ্যাঁ।

বেঁচে গেলে। এ রক্ত না বেরিয়ে গেলে, আরো রক্ত তোমার মাথায় উঠে যেত।

তোমার সমাধি আর ভাঙত না।—খুব সময়ে তোমার রক্ত পড়ে গেছে।

হৃদয়কে ডেকে হলধারী বললেন, আচ্ছা হৃদে, তুই বল গদাই যে পৈতে ফেলে, কাপড় ফেলে সাধনা করছে, একি ঠিক।

হৃদয় হলধারীকে ভয় পায়।

বলল, তা কখনো হয়? মামা তো বদ্ধ পাগল!

তাই বল।—হলধারী বললেন, দেখে পাগল মনে হয় বটে, কিন্তু

আমার মনে হয় কি জানিস? পাগল বটে তবে অলৌকিক পাগল। সাধারণ পাগল নয়।

হৃদয় বোকা সাজে।

কি যে বল মামা!

সত্যি করে বল দেখি, ওর মধ্যে কিছু আশ্চর্য দর্শন হয়েছে কি কি না তোর?

দূর!—কি যে বল।

তাহলে চাকরের মত খাটিস কেন?

না খেটে কি করি বল! সব হলেও মামা তো বটে। এই ধর তুমিও মামা, তুমি পণ্ডিত লোক, সব বুঝে কাজ কর। কিন্তু এ পাগল মামাকে আমি ভাগ্নে হয়ে যদি না সামলাই, কে সামলাবে বল? তখন তোমরাই আবার আমাকে বকবে।

তাই বল।—

এই হলধারীই আবার একদিন বলেছিলেন, ওরে রামকৃষ্ণ এবার তোকে চিনেছি।

হলধারী ভাবলেন, গদাই তো আকাট মূর্খ, শাস্ত্রের মর্ম কি বোঝে?—ডেকে পাঠালেন গদাধরকে।—

বললেন, বোস। তুই কি শাস্ত্রের কিছু বুঝিস? তুই তো মূর্খ।

গদাধর বলল, আমি মূর্খ, কিন্তু আমার ভিতরে যিনি বসে আছেন, তিনি তো মূর্খ নয়।

ছেলে মারা যাবার পর থেকে হলধারী কালীকে বলেন, তমোগুণান্বিতা, তামসিক।

শুনতে পেয়ে গদাধর ক্ষেপে গেল।

লাঠি নিয়ে ছুটে গেল।

তবে রে শালা, আমার মাকে তুই তামসিক বলিস।

ঘাড় চেপে ধরল হলধারীর।

হলধারীর কি হলো কে জানে। হাতের বেলপাতা আর ফুল দিয়ে গদাধরকে প্রণাম করল।

—কিগো মামা, গদাই না পাগল হয়েছে! এখন?

কি জানি! বোধ হয় আমিই পাগল হয়েছি। হলধারী বললেম, আমি যেন গদাধরের মধ্যে আমার ইষ্টদেবকে দেখতে পেলাম।

কাঙ্গাল ভোজন হয়েছে, গদাধর এঁটো পাতা ঘাঁটছে।—

ছুটে এলেন হলধারী।—

এসব কি হচ্ছে গদাই, ক্যাঙ্গালীদের এঁটো খাচ্ছিস তোর ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে না।

ঠাকুর ক্ষেপে গেলেন। বাঁশ তুলে বললেন, তবে রে শালা, তুই না গীতা, চণ্ডী পড়িস? তুই না শেখাস জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মসত্য, সর্ব্বভূতে না ব্রহ্মদৃষ্টি? ভেবেছিস আমি জগৎ মিথ্যা বলব আর ড্যাং ড্যাং করে ছেলেপুলের বাপ হয়ে বগল বাজাব? তোর শাস্ত্র পাঠের মুখে আগুন।

রাণী রাসমণির সম্পত্তির এক্সিকিউটিভ হলেন মথুরবাবু, রাণীর জামাই।

তাকেও একদিন বাঁশ দিয়ে মারতে ছুটলেন ঠাকুর।

মথুরবাবু বললেন, আপনার নামে কিছু জমি দানপত্র করে দেই—

তবে রে শালা! ঠাকুর বাঁশ ওঠালেন, আমাকে সংসারে জড়াবার মৎলব? আমাকে কড়াইয়ের ডালের খদ্দের পেয়েছ?

সংসারীদের ঠাকুর কলাইয়ের ডালের খদ্দের বলেন।

॥ এগার ॥

গদাধর আর মন্দিরে পূজো করে না। মাথার চুলে জট ধরেছে। কাপড় ঠিক থাকেনা। কাঁধে বাঁশ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মন্দিরের চারদিকে।

চন্দ্রমণি শুনলেন।

কত লোক কত কথা বলে যায়। কেউ বলে পাগল হয়েছে। কেউ বলে রাণী তাড়িয়ে দিয়েছে। নানা রকম গুজব আসে কামারপুকুরে। চন্দ্রমণি শোনেন আর অস্থির হয়ে ওঠেন।

রামেশ্বরের কাছে চিঠি গেল। গদাইকে কামারপুকুরে নিয়ে এসো। বলো মা ডাকছেন। তাহলে যত পাগলই হোক, আসবে।

গদাধর এলো কামারপুকুরে।

ছেলেকে দেখে চন্দ্রমণি কেঁদে ফেললেন। এ কি হয়েছে! কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে, কখনো মা মা বলে চেঁচিয়ে উঠছে।

চন্দ্রমণি ছেলের গয়ে হাত বুলিয়ে ছেলেকে সুস্থির করেন।

মাকে বড় ভালবাসিস গদাধর।

গাঁয়ের লোকেরা দেখতে এসেছে গদাধরকে। দেখে শুনে বলল, না গো না, এ ছেলে পাগল নয়। তাহলে মা'কে এত ভালবাসত না। কাঁধে কিছু ভর করেছে।

গদাইএর মা, তুমি গুণীন ওঝার ব্যবস্থা কর।

ওঝা এলো। মস্ত বড় গুণীন। বলল, না আপনার ছেলের কাঁধে কিছু ভর করেনি।

অনেক রাত হয়েছে গদাই ফেরে না। চন্দ্রমণি আশঙ্কায় এতটুকু হয়ে গেলেন।

রামেশ্বর বলল, আমি দেখেছি।

রামেশ্বর জানে গদাই কোথায় আছে।

শ্মশানের কাছে গদাইএর নাম ধরে ডাকল।

গদাই বলল, যাই দাদা, তুমি আর এগিয়ো না। আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। তোমাকে পেলে অনিষ্ট করবে।

রামেশ্বর বলল, মা, গাদাইর বিয়ে দাও। তাহলে মনটা ঘরমুখো হবে। কাঁধে চাপ পড়লেই বাউণ্ডুলে স্বভাব শোধরাবে। কিন্তু দেখো গদাইএর কানে যেন না যায়।

গদাই শুনে কিন্তু খুব খুশি। ঘটক লাগানো হলো হৃদয়ের দাদা লক্ষ্মী মুখুজ্জেকে।

গদাধর বলল, আমার জন্য কোথায় মেয়ে খুঁজে বেড়াবে? জয়রামবাটিতে কুটোবাঁধা হয়ে আছে।

কুটোবাঁধা! সে কি?

ক্ষেতে যখন শশা হয়, প্রথম ফলটি চাষী কুটো বেঁধে রাখে। সেটি লাগবে দেবতার ভোগে। বিক্রী হবে না, যত খুশি দাম দাও না কেন।

পাঁচ বছরের সারদার সঙ্গে বিয়ে হলো একুশ বছরের গদাধরের। রাম মুখুজ্জে পেলেন তিনশ টাকা কন্যা পণ।

বউতো ঘরে এলো, কিন্তু গহনা কই? নতুন বউকে সাজাতে হবে। লাহাবাবুদের বাড়ি থেকে গয়না আনলেন চন্দ্রমণি।

কাজ হয়ে গেলে ফিরিয়ে দিতে হবে। গদাধর বলল, আমি খুলে দেব।

ভোরে উঠে গায়ে গয়না না দেখে সারদা বলল, আমার গয়না কই ?

চন্দ্রমণি সান্ত্বনা দিলেন, ও গেছে গেছে, আমার গদাই তোমাকে ভাল গয়না দেবে।

ব্যাপার দেখে সারদার খুড়ো চটে গেলেন। মেয়ে নিয়ে চলে গেলেন জয়রামবাটি। গদাই বলল, যাক না, যাবে কোথায় ? বিয়ে হয়ে গেছে না। আসতেই হবে এখানে।

বিয়ে করতে যাবে। মেজ বউ ঠাকুরুণ বললেন, একটা বাজনা না থাকলে কি বিয়ে জমে ? বিয়েতে চাই সাজনা আর বাজনা।

গদাধর বলল, দাঁড়াও আমি বাজনা বাজাচ্ছি।

দুহাতে পাছা বাজাতে বাজাতে মুখে ঢোলের বোল বলতে বলতে বিয়ে করতে গেল গদাধর।

গদাধর এসেছে কামারপুকুরে। পেটের অসুখে ভুগছে। সঙ্গে আছে হৃদে আর যোগেশ্বরী ভৈরবী।

বকুলতলার ঘাটে প্রথম নৌকো থেমেছিল যোগেশ্বরীর। পরিচয় ? ঠাকুরকে প্রথমে দীক্ষা দেয় যোগেশ্বরী। বলে যশোর জেলায় আমার ঘর ছিল, আমি বামুনের মেয়ে। তারপরে আর কিছু জানতে চেয়ো না। পুরানো পরিচয় আর সব হারিয়ে গেছে। এখন আমি ভৈরবী। যোগেশ্বরী নাম।

ভৈরবী বলে, ঠাকুর অবতার। নিতাই, গৌর একসঙ্গে এবার রামকৃষ্ণ হয়ে মর্তে এসেছেন।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কথা তুমি জানলে কি করে গো ?

মহামায়া জানিয়েছেন। দুজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে বাকী তুমি।

বিষ্ণুঘরে গয়না চুরি গেল।

মথুরবাবু বললেন, ঠাকুর তুমি গয়না রক্ষা করতে পারলে না ?

ঠাকুর বললেন, তোমার বুদ্ধি কি গো ! স্বয়ং লক্ষ্মী যার দাসী

তাঁর ঐশ্বর্য্যের অভাব ! ও গয়না তোমার আমার কাছে কিছু, কিন্তু ভগবানের কাছে মাটির ঢ্যালা।

ঠাকুর এসেছেন কলকাতায়। হৃদয় সহর দেখাতে নিয়ে বার হল।

লাট সাহেবের বাড়ি দেখিয়ে বলল, মামা দেখ লাট সাহেবের বাড়ি। থামগুলির দিকে তাকিয়ে দেখ, কত বড়।

ঠাকুর বললেন, থাম কোথায়, ও তো কতগুলি মাটি চাক চাক করে সাজিয়ে রেখেছে।

কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরেই গদাধর আবার আগের মত। মথুরবাবু আবার গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে পূর্ববঙ্গের একজন বৈদ্য বসেছিলেন। ঠাকুরকে দেখে বললেন, ওষুধে এ অসুখ সারে না।

চন্দ্রমণি বুড়ো শিবের মন্দিরে হত্যা দিলেন। প্রত্যাদেশ হলো মুকুন্দপুরে যা। সেখানে গিয়ে হত্যা দে।

চন্দ্রমণি ছুটলেন মুকুন্দপুর। হত্যা দিয়ে পড়ে রইলেন মন্দিরের দরজায়। প্রত্যাদেশ হলো, তুই ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ি যা। তোর ছেলে পাগল নয়। ঐশীভাবে বিভোর হয়ে আছে। কোন ভয় নেই।

ঠাকুর মহাদেবের স্তোত্র পড়ছেন। বিভোর হয়ে গেছেন।

মন্দিরের কর্মচারীরা ছুটে এলো, ছোট ভট্চাজ ক্ষেপেছে। যাক্ আজ সেজবাবু উপস্থিত আছেন। ধরে পাগলাটাকে বেঁধে রাখ। নয়ত কোন অঘটন ঘটিয়ে বসে ঠিক কি !

গোলমাল শুনে মথুরবাবুও এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

বললেন, কেউ কিছু বলো না।

দাঁড়িয়ে রইলেন মুগ্ধভাবে।

জ্ঞান ফিরে এলে ঠাকুর দেখলেন অনেক লোক জমা হয়েছে।

বললেন, কিছু অঘটন করে ফেলিনি তো?

না আপনি স্তব পড়ছিলেন, আমরা শুনছিলাম।

একদিন বারান্দায় পায়চারি করছেন ঠাকুর। কাছারি বাড়িতে বসে মথুরবাবু দেখছেন। হঠাৎ ছুটে এসে ঠাকুরের পায়ে পড়লেন।

ব্যস্ত হয়ে ঠাকুর মথুরবাবুকে ধরে উঠালেন।

আরে একি! একি করছেন! আপনি রাণীর জামাই গণ্যমান্য, লোকে দেখলে কি বলবে!

সে কথা মথুরবাবুর কানে যায় না।

বললেন, আমি দেখেছি—আপনি যখন পূব থেকে পশ্চিমে যান, তখন দেখি মা মন্দিরে যাচ্ছেন। যখন পশ্চিম থেকে পূবে যান, তখন দেখি স্বয়ং মহাদেব। আজ আমার অপরূপ দর্শন হলো।

যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেড়াতে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুরকে বললেন, আমরা সংসারী লোক, আমাদের কি মুক্তি আছে? স্বয়ং যুধীষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন আমরা কোন্ ছার!

বিরক্ত হলেন ঠাকুর।

বললেন, যুধীষ্ঠিরকে বুঝতে গিয়ে ঐ নরক দর্শনটুকুই মনে আছে। সত্য, ক্ষমা, ধর্ম, বৈরাগ্য, কৃষ্ণভক্তি এসব বুঝি নজরে পড়েনি?

হৃদয় মামার মুখ চেপে ধরল।

যতীন্দ্রনাথ সরে পড়লেন।

ঠাকুর শ্রীমাকে ষোড়শী পূজা করলেন।

তোতাপুরী বললেন, খুব যে কাম জয়ের বড়াই কর। থাক স্ত্রীর সঙ্গে, বুঝি তোমার বুকের পাটা।

পাশাপাশি দুটি খাট। একটি বড় একটি ছোট। ছোটটিতে ঘুমিয়ে আছে সারদা। ঠাকুর ভয় পেলেন।

ভয় আবার কাকে? সারদাকে, অষ্টাদশী সারদাকে। যদি

মোহিনীরূপ ধরে! কত মুনি, ঋষি, যোগীপুরুষ তলিয়ে যায়, সর্বত্যাগী শঙ্কর উন্মাদ হয়—সেই মোহিনী রূপ।

গদাধর আকুল প্রার্থনা করে, মা ওর ভিতর থেকে কামভাব দূর করে দে।

ছেলের আকুলতায় মা কি সাড়া না দিয়ে পারেন?

সারদা অভয় দিল, আমি তোমার স্ত্রী তোমার শক্তি। তুমি অগ্নি আমি দাহিকা। তুমি সাধনা আমি সিদ্ধি। তুমি কর্ম আমি গতি। তোমাকে আমি পিছু টানব না এগিয়ে দেব।

আমি কি তোমায় ত্যাগ করেছি? ঠাকুর বললেন।

না তুমি গ্রহণ করেছ।

যেমন শক্তি আর শিব, রাধা আর কৃষ্ণ, সীতা আর রাম তেমন গদাই আর সারদা।

তোতাপুরীকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন,—আপনি কি তোতাপুরী?

হাঁ আমি তোতাপুরী। তুমি জানলে কি করে? সাধন-ভজন কিছু করবে?

আমি কি জানি?

তবে কে জানে?

মা জানেন।

কে তোমার মা?

মন্দিরের দিকে দেখিয়ে দিল গদাধর।

তোতাপুরীর মুখে ফুটে উঠল বিদ্রূপের হাসি। ওতো একটা পুতুল। আচ্ছা যাও জেনে এসো।

ধুনুচি থেকে আগুন তুলে নিয়েছে মালী। তোতাপুরী চিমটে উঁচিয়ে তাড়া করল।

ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন,—দূর-শালা! আবার বলে সর্ব ঘটে ব্রহ্ম বিরাজ করে।

একদিন হাজির হল গৌরীকান্ত তর্কভূষণ। গৌরীকান্ত তান্ত্রিক। যেমন পণ্ডিত তেমনি তার্কিক। কালীমন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকে হুঙ্কার ছাড়ল।

চমকে উঠল গদাধর। স্তোত্রাংশ আবৃত্তি করছে গৌরীকান্ত। গদাধরও আবৃত্তি করে উঠল। প্রবলতর ধ্বনিতে।

যে যেখানে ছিল ছুটে এলো। কে এমন সিংহনাদ করে!

গৌরী পণ্ডিতের সঙ্গে পাগলা পুরুতের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। কার গলায় কত জোর।

গৌরীকান্ত হেরে গেল। সবাই অবাক, পাগলাপুরুতের গলায় এত জোর!

মথুরবাবুর নাটমন্দিরে বিচারসভা বসেছে। গৌরীকান্তের সঙ্গে তর্ক হবে বৈষ্ণবচরণের।

সভায় যাবার আগে কালী প্রণাম করতে বেরিয়ে, গদাধরের পায়ে পড়ল বৈষ্ণবচরণ।

গৌরীকান্ত বললেন,—বৈষ্ণবচরণ আজ বিষ্ণুচরণের স্পর্শ পেয়েছে। আজ সে অজেয়। তাকে পরাস্ত করা আজ মানুষের সাধ্য নয়।

নরেনকে ডেকে বললেন ঠাকুর,—আমার মধ্যে অষ্টসিদ্ধি আছে, নিবি? যদি নিস তো দেই। বল নিবি?

তাহলে ঈশ্বর লাভ হবে?

না।

তাহলে আমার দরকার নাই।

ঠাকুর খুব খুশি।

স্ত্রীলোক মাত্রই ঠাকুরের মা।

যোগেশ্বরী এক পূর্ণ যুবতীকে এনে বিবস্ত্র করে বেদীর উপরে বসিয়ে দিল।

শিউরে উঠল গদাধর।

ভৈরবী বলল,—বাবা সাক্ষাৎ জননী জ্ঞানে যেয়ে কোলে বসো।

একি বলছিস্ মা! আমি তোর দুর্বল সন্তান, আমাকে এসব কেন বলছিস্?

কে বলে তুই আমার দুর্বল সন্তান! সবচেয়ে জোরদার তুই।

রমণীর কোলে বসেই গদাধর সমাধিস্থ হয়ে পড়ল।

যোগেশ্বরী বলল,—বাবা তুমি পরীক্ষায় পার হয়েছ।

যোগেশ্বরীকে নিয়ে কামারপুকুরে এলেন ঠাকুর। পেটের অসুখে ভুগছেন। মথুরবাবু আর জগদম্বা গোছগাছ করে ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিলেন। দু'মাস থাকবেন কামারপুকুরে।

জয়রামবাটিতে সারদার কাছে খবর গেল। সারদা এলেন কামারপুকুরে।

একে লোকে পাগল বলে! এ যে রূপের খনি, গভীর সমুদ্র, সদানন্দ। মহেশ্বরও পাগল, রামকৃষ্ণও পাগল—তবে ভাল কে?

ওগো, আজ এই আজ এই রান্না হবে। ভোরে উঠেই ঠাকুর ফিরিস্তি শোনায় সারদাকে।

একদিন ফোড়ন ছিল না। ঠাকুর বললেন,—ফোড়ন নাই? আনিয়ে নাও। যাতে যা লাগে—তা বাদ দিলে কখন হয়?

যার যা দরকার! ঠাকুরও সেই ফোড়ন দিতেন। কাউকে বলতেন তত্ত্বকথা, কাউকে বা মুখের কথা।

মানুষ কেমন জান? পায়রার মত। পায়রার গলা টিপে দেখ জমান খাবার গজগজ করছে। এখানে সংসারীরা আসে। কাম-কাঞ্চনের ভাবনা থাকে লুকান।

সারদা এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। নবতঘরে থাকেন। ঠাকুর বলেন খাঁচা। সারদার সঙ্গে লক্ষ্মী থাকে। তাই ঠাকুর বলেন,—

খাঁচায় আছে শুক-সারী। সারদার নাকে নথ। নাকের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে ঠাকুর ইশারায় বুঝিয়ে দেন। রামলালকে ডেকে বলেন,—ওরে রামনেলো, খাঁচায় শুক-সারীকে চাট্টি ছোলা দিস্।

লোকে ভাবে ঠাকুর সত্যি বুঝি পাখি পুষেছেন।

কামারপুকুরে খেতে বসে একদিন ঠাকুর বললেন,—ওরে হৃদে এগুলো যে রেঁধেছে সে হচ্ছে রামদাস বত্তি আর এগুলো যে রেঁধেছে সে হলো ছিনাথ হাতুড়ে।

সারদা আর লক্ষ্মীর মা দু'জনে রেঁধেছে। লক্ষ্মীর মার রান্নায় তার আছে। তাই লক্ষ্মীর মা রামদাস বত্তি।

ঠাকুর বেড়াতে গেছেন ভূতির খালের দিকে। সঙ্গে আছে হৃদে। মেয়েরা খালে এসেছে জল ভরতে। ঠাকুরকে দেখে একজন আর একজনকে আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগল।

ওরে হৃদে, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে।

সেকি মামা! হৃদয় বলল, ঘোমটা দেবে কেন?

দিয়ে দে, ওরা আমার বাইরের রূপ দেখছে। দিবি তো দে, না হলে আমি ল্যাংটো হব।

জয়রামবাটির ক্ষেত্র বিশ্বাসের মেয়ে ভানুদাসী। কুড়ি বছরে বিধবা হয়েছে। সারদার উপরে বড় টান। ঠাকুরকে সবাই বলে ক্ষ্যাপা জামাই।

ভানুদাসী কিন্তু ঠিক বুঝেছে।

মেয়েমহল ভীড় করে আসে জামাই দেখতে। ক্ষ্যাপা জামাই এমন কথা বলে যে হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যায়। লজ্জায় পালাবার পথ পায় না।

ঠাকুর বলেন,—বেশ হলো, আখড়াগুলো সব উড়ে গেল। এবার বসো সবাই গোল হয়ে।

ভানুদাসীকে বললেন,—আমাকে পানের খিলি তৈরি করে খাওয়াতে পারিস ?

কামারপুকুর ফিরে চলেছেন ঠাকুর। ভানুদাসী খিলি হাতে পিছনে ছুটছে।

শিওরে এসেছেন ঠাকুর। দিদি হেমাঙ্গিনী ফুল আনলেন। পায়ে ঢেলে দিলেন ফুল। বলল,—আমাকে বর দাও, আমি যেন সজ্ঞানে কাশীতে গঙ্গালাভ করি।

হৃদয় ভাবে, আমার তো মামাই আছে। সাধন ভজন দিয়ে কি হবে ? মামা কি আমাকে ফেলে দেবেন ?

ডঙ্কা মেরে বিষয়-আশয়ের ফিকিরে বেড়ায় হৃদয়।

হৃদয়ের স্ত্রীবিয়োগ হলো। হৃদয়ের মনটিও ঘুরল উল্টোমুখো।

সব ছেড়ে ধ্যানে মেতে উঠল।

'মামা তোমার মত আমাকে ভাবটাব কিছু দাও মামা।

ওসবে তোর দরকার নাই।

খুব আছে, দেবে কিনা বল। হৃদয় জোর করে।

ঠাকুর বলেন,—আমি কি জানি, মাকে বল, মা যদি দেন হবে।

ধীরে ধীরে হৃদয়ের দর্শন হতে লাগল।

মথুরবাবু প্রমাদ গণলেন।

বললেন,—হৃদয়ের আবার এসব হচ্ছে কেন ?

ঠাকুর বললেন,—চিন্তা নাই, দুদিনে ঠিক হয়ে যাবে।

ধ্যানে বসে হৃদয় চেঁচিয়ে উঠল,—ও রামকৃষ্ণ দাঁড়াও, আমরা দুজনেই ভগবানের অবতার, চল দেশে দেশে গিয়ে জীব উদ্ধার করি।

ঠাকুর হৃদয়ের বুকে হাত দিয়ে বললেন.—দে মা শালাকে জড় করে।

দিব্য দর্শন মুহূর্তে ছুটে গেল। কেঁদে ফেলল হৃদয়। মামা আমাকে একি করলে ?

তোকে চুপ করিয়ে দিলাম।

পঞ্চবটি বনে ঠাকুরের আসনে বসেছে হৃদয়। ধ্যান করবে।

চেঁচিয়ে উঠল,—জ্বলে গেলাম, জ্বলে গেলাম।

আর্তনাদ শুনে ছুটে এলেন ঠাকুর।

জ্বলে গেল মামা, জ্বলে গেল। এখানে বসতেই কে যেন এক মালশা আগুন গায়ে ঢেলে দিল!

ঠাকুর হৃদয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বার মরণাপন্ন অসুখ। বাঁচবার আশা নাই। মথুরবাবু এলেন জানবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বর।

বাবা, আমার যা হবার হবে, কিন্তু তোমার সেবা হবে কি করে?

ঠাকুর বললেন,—যাও বাড়ি যাও। ভয় নাই তোমার স্ত্রী ভাল হয়ে গেছে।

মথুররাবু বাড়ি ফিরলেন। অবাক হলেন বাড়ি ফিরে। যাবার সময় যাকে দেখে গেছেন এখন তখন, সে উঠে বসে হেসে কথা বলছে।

মথুরবাবু নিজে পড়লেন অসুখে। ফোড়ার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। হৃদয়ের কাছে খবর পাঠালেন—বাবা যেন একবার আসেন।

ঠাকুর বললেন,—আমি যেয়ে কি করব? আমি কি ফোঁড়া ভাল করতে পারি!

মথুরবাবু আবার ডেকে পাঠালেন।

ঠাকুর এবার না যেয়ে থাকতে পারলেন না।

অনেক কষ্টে তাকিয়া ভর দিয়ে উঠে বসলেন মথুরবাবু; যাক্ এসেছ, একটু পায়ের ধূলো দাও।

তুমি ভাবছ আমার পায়ের ধূলো নিলেই তুমি ভাল হয়ে যাবে?

আমি কি এমনি বাবা? আমি কি ফোঁড়ার জন্য তোমার পায়ের ধূলো চাইছি। আমি চাইছি ভবসাগর পার হবার জন্য।

এক এক সময়ে গোঁ ধরেন মথুরবাবু। তখন একমাত্র উপায় ঠাকুর।

বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন দেবেন না। বললেন,—প্রতিমা বিসর্জন হবে না। রোজ পূজো হবে। জগদম্বার কথাও রাখলেন না। এক কথা প্রতিমা বিসর্জন হবে না।

জগদম্বা ঠাকুরের কাছে সংবাদ পাঠালেন।

না মাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না। মাকে বিসর্জন দেওয়া হবে না।

ঠাকুর বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন।

মাকে ছেড়ে কেউ বাঁচতে পারে না। বিসর্জন দিলেই মা যাবেন কোথায়? তিনদিন বাইরের দালানে পূজো নিয়েছেন, আজ থেকে পূজো নেবেন ভিতরের দালানে।

রাসমণি ঠাকুরকে এনেছেন জানবাজারের বাড়িতে। বাড়ির পুরোহিতের পছন্দ নয়। ভাবল এ থাকলে আমার ভাত যাবে। সেজবাবু আর রাণীমাকে হাত করেছে। ফিকিরে ঘোরে পুরুত ঠাকুর। একদিন সুযোগ পেল। ঠাকুর একা বসেছিলেন। অর্দ্ধ সমাধিভাব। পুরুত হালদার ঘরে ঢুকে বলল, এই বামুন বলনা বাবুটিকে কি করে হাত করলি? ঠাকুর উত্তর দিলেন না। হালদারের রাগ হলো। বলল, বলবি নারে বিটলে বামুন? তবে দেখ কেমন লাগে।

হালদার ঠাকুরকে লাথি দিয়ে চলে গেল।

মথুরবাবু জানতে পেরে হালদারকে ধরে আনবার জন্য লোক পাঠালেন।

ঠাকুর কিন্তু কিছু জানতে পারেনি।

রাগ না চণ্ডাল। মথুরবাবুকে বললেন, হালদারকে কিছু বলো না। আমার কিছু মনে নাই। তাকে আমি ক্ষমা করেছি।

মথুরবাবুর জ্বর বিকার হয়েছে। ঠাকুর গেছেন।

মথুরবাবু বললেন, আচ্ছা সেই যে তুমি বলেছিলে তোমার অনেক ভক্ত আসবে, তারা তো এলো না। কখন আসবে?

ঠাকুর বুঝলেন, এবার মা নিজে মথুরবাবুকে নিয়ে যাবেন।

ঠাকুর ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। নিজে আর যান না। হৃদয়কে পাঠান।

ভক্তদের বললেন, জানিস আমাকে দেখে সে কি বলত? বাবা তোমার ভিতরে শুধু ঈশ্বর আছে।

ভাইপো অক্ষয় এসেছে বিষ্ণুমন্দিরে পূজারী হয়ে। অক্ষয় অসুখে পড়ল।

ঠাকুর হৃদয়কে বললেন, হৃদয় লক্ষণ ভাল নয়। ছোঁড়া বাঁচবে না।

অন্তিম মুহূর্তে পাশে বসে বললেন, অক্ষয় বল, গঙ্গা. নারায়ণ, ওঁ রাম।

মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল হৃদয়। ঠাকুর ভাবে ডুব মারলেন। হৃদয় যত কাঁদে ঠাকুর তত হাসেন।

দাহ করে ফিরে এলে ঠাকুর কেঁদে উঠলেন।

ঠাকুর বলতেন, ওরে বাসনায় আগুন দে।

বড় তক্তপোসটিতে বসে আছেন ঠাকুর। ছোটটিতে শুয়ে আছেন শ্রীমা। ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। বিছানার উপরে বসে আছেন ঠাকুর, নিশ্চল। ভয় পেলেন সারদা। এমন ভাবারূঢ় মূর্তি কখন দেখেন নি।

খবর পাঠালেন হৃদয়ের কাছে।

হৃদয় এসে নাম শোনালে ঠাকুরের ঘোর কাটল।

কাশীপুরের মহিমাচরণ ঠাকুরের ভক্ত। কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানই সব মাটি করেছে। ভক্তির চেয়ে শাস্ত্রের উপর টান বেশি। সব সময় ভাবটি দেখান যেন খুব পড়াশুনা আছে। ইংরাজি আর সংস্কৃতের খই ফুটছে মুখে। প্রাচ্য-আর্য্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষদ নামে স্কুল করেছেন। ছেলের নাম রেখেছেন মৃগাঙ্ক মৌলি পতিতুণ্ডি। হরিণের নাম রেখেছেন, কপিঞ্জল। গুরুর নাম আগমবাগীশ ডমুর বল্লভ।

দক্ষিণেশ্বরে এলেই ঠাকুর বলেন, একি এখানে জাহাজ? ছোটখাট ডিঙ্গি আসতে পারে কিন্তু একেবারে জাহাজ দেখছি যে গো!

মাঝে মাঝে গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষের মালা পরে আসে মহিমাচরণ। বাঘের ছাল পেতে বসে পঞ্চবটিতে। যাবার সময় ছালটিকে টাঙিয়ে রেখে যায় ঠাকুরের ঘরে।

ঠাকুর বলেন, ও এখানে বাঘের ছাল কেন রাখে জানিস? লোকে দেখলে জিজ্ঞাসা করবে, তখন ওর নাম বলব তাতেই ওর তৃপ্তি।

চিনু শাঁখারি এসেছে ঠাকুরের প্রসাদ নিতে। ভক্তি দেখে যোগেশ্বরী মহা খুশি। এঁটো পাতা পরিষ্কার করতে গেল। যোগেশ্বরী বলল, তুমি যাও আমি করব।

হৃদয় তেড়ে এলো। গাঁয়ের বামুন মেয়েরাও হৃদয়ের দিকে।

হৃদয় বলল, এসব এখানে চলবে না।

কেন দোষ কি, চিনু ভক্ত লোক।

হোক ভক্ত। ওর এঁটো ছুঁলে আমাদের ঘরে তোমার জায়গা হবে না।

কথায় কথায় লেগে গেল ঝগড়া। যোগেশ্বরী ত্রিশূল উঁচিয়ে ধরল। হৃদয়ও বাঁশ নিয়ে উঠল।

হৃদয় হঠাৎ একটা কিছু ছুঁড়ে মারল। যোগেশ্বরীর কানে লেগে রক্ত পড়তে লাগল।

ঠাকুর কেঁদে উঠলেন, ওরে হৃদে তুই একি করলি?

যোগেশ্বরীও কি হলো উপরের দিকে তাকায় আর ভয় পায়।

লাহাবাবুর মেয়ে প্রসন্ন দাঁড়িয়েছিল। বলল, ও প্রসন্ন একি হলো? আমি এখন কোথায় যাই, বৃন্দাবন না জগন্নাথ?

কয়েকদিন পরে যোগেশ্বরী চলে গেল।

জয়রামবাটিতে গেছেন ঠাকুর।

অনেক রাতে ঠাকুর হঠাৎ বিছানায় উঠে বসলেন।

আমি খাইনি ভীষণ খিদে পেয়েছে।

মেয়েরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। ঘরে কিছু নাই, এখন জামাইকে কি খেতে দেয়া যায়?

কি হবে ঘরে যে কিছু নাই।

আছে। দেখগে নিশ্চয় কিছু আছে।

রান্নাঘরে একটা মৌরলা মাছ আর কাঁই পড়েছিল। সারদা তাই এনে দিলেন, আর সেই সঙ্গে দিলেন পান্তা ভাত।

শাশুড়িকে দুঃখ করতে শুনে ঠাকুর একদিন বললেন।

আপনার মেয়েদের এত ছেলে হবে যে, মা ডাক শুনে অস্থির হয়ে যাবে।

শ্রীমাও বলে গেছেন, সে কথা ঠিক হয়েছে। আমার এখন কত ছেলে।

কামারপুকুরেও একদিন রাতের বেলা ঠাকুর বললেন, কিগো তোমরা আমাকে খেতে দেবে না?

লক্ষ্মীর মা বলল, সে কি কথা এই তো তুমি খেয়ে গেলে।

কই খেলাম। এইত আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।

সবাই বুঝল ঠাকুরের ভাবাবেশ হয়েছে।

ডালায় করে চারটি মুড়ি এনে দিল। ঠাকুর মুখ ফিরিয়ে রইলেন। শুধু মুড়ি আমি খাবনা।

ভাইপো রামলাল গেল বাজারে মিষ্টি কিনে আনতে।

কামারপুকুর থেকে শরীর ভাল করে ঠাকুর ফিরছেন দক্ষিণেশ্বরে। বর্দ্ধমানের কাছে একটি মাঠের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

হৃদে দেখ কেমন ফুল ফুটেছে। এ ফুলে শূলপাণি সন্তুষ্ট হন।

হৃদয় বলল, কিন্তু মাঠভরা ফুল ছাড়া আর কি আছে দেখতে পাচ্ছ না মামা? সব নোংরা করে রেখেছে।

ঠাকুর বললেন, তা হোক। আমি পুজো করব। ঐখানে বসেই পূজো করবো।

ঠাকুরের কাছে চন্দন আর বিষ্ঠায় ভেদ নাই।

কাঙ্গালী ভোজন হয়েছে। এক পাগল এসেছে সেখানে। তার অবস্থা এমন যে কাঙ্গালীরাও তাকে তাড়িয়ে দিল।

পাগল এঁটো পাতা কুড়িয়ে খেল।

ঠাকুর বললেন, ওরে হৃদে, এ জ্ঞানোম্মাদ।

হৃদয় ছুটল পাগলের পিছনে।

মহারাজ ভগবান কি করে পাব বলে দিন।

ঘুরে দাঁড়াল পাগল। পচা নর্দমার জল দেখিয়ে বলল, গঙ্গাজল আর এই নর্দমার জল যেদিন তোর কাছে এক হবে।

মহারাজ, আমাকে আপনার চেলা করে নিয়ে চলুন।

তবে রে শালা! পাগল ঢিল কুড়িয়ে নিল।

জগদম্বা তীর্থে যাবে। সঙ্গে ঠাকুরকেও নিয়ে যাবে।

কাশীতে এসে দেখা করলেন তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে। স্বামীজি ঠাকুরকে একটা নস্যির কৌটো উপহার দিলেন।

সিমলার রাম দত্ত, কুলগুরুর কাছে দীক্ষা না নিয়ে, দীক্ষা নিলেন ঠাকুরের কাছে।

পাড়ায় টি টি পড়ে গেল।

রাম ডাক্তার আর গুরু পেল না। শেষ পর্যন্ত কৈবর্তের পূজারীর কাছে দীক্ষা নিল।

পাড়ার সুরেশ মিত্তির বলল, ওহে রাম আমাকে তোমার গুরুর কাছে নিয়ে চল। কেমন হংস দেখে আসি।

সুরেশ মিত্তির কেশব সেনের ঢোলের চামড়া কেটে দিয়ে বিডন স্কোয়ারে সভা করতে দেয় নি।

রাম দত্ত ঠাকুরকেও জানে সুরেশ মিত্তিরকেও চেনে। মনে মনে বলল, চল বাছা তারপর দেখা যাবে কেরামতি!

সুরেশ মিত্তির বলল,—শোন তোমার রামকৃষ্ণ যদি আমাকে শান্তি দিতে না পারে, তবে কান মলে দিয়ে আসব।

রাম দত্ত দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে এসে বলে বেড়াল, কানমলা খেয়ে এলাম। ঠাকুর আমাকে কৃপা করেছেন।

নরেন ছিল আরো দুর্ধর্ষ।

তেড়েফুঁড়ে কথা বলে। কথার দাপটে ভূত পালায়।

রাম দত্ত বলল,—বিলে দক্ষিণেশ্বর চল। পরমহংস সেখানে আছেন।

নরেন বলল,—ওটা তো মুখ্খু। ওটার কাছে যেয়ে কি হবে? এত বই পড়ে কিনারা পেলাম না, আর কিনারা করবে এক মুখ্খু বামুন? ওটা জানে কি?

রাম দত্ত বলল,—একবার যেয়েই দেখ না।

বেশ যাব। কিন্তু যদি রসগোল্লা না খাওয়াতে পারে তবে কান মলে দিয়ে আসব।

কৈলাস বসুও ঠাকুরের কান মলতে চেয়েছিলেন।

রাম দত্তকে বললেন,—তুমি বলছ তাই যাব। ভাল লোক হয়ত ভাল, নাহলে আচ্ছা করে কান মলে দেব।

রাম দত্তের সঙ্গে কৈলাস বসু দক্ষিণেশ্বরে এলেন।

একজন এসে বলল,—যে বাবুটি ঠাকুরের কান মলতে চেয়েছিলেন, ঠাকুর তাকে ডাকছেন।

আর কৈলাস কান মলতে এসে নিজেই কান মলা খেলেন। সিমলা ষ্ট্রীটের ঘরে বসে কথা! সে কথা দক্ষিণেশ্বরে পাগলা ঠাকুর জানল কি করে?

গিরীশ ঘোষ আর এক কাঠি উপরে উঠল। মাতাল হয়ে ঠাকুরের বাপান্ত করল।

ঠাকুর বললেন, - রাম! গিরীশ আজ আমাকে যা-তা বলে বাপান্ত করে গেছে।

ওটা একটা পাষণ্ড! আপনি যান কেন? ওকে আস্কারা দেন কেন?

তা বলে এরকম ব্যবহার করবে?

কেন খারাপ কি করেছে? রাম দত্ত বলল,—আপনি যা যাকে বলান সে তাই বলে।

শোন গো রাম কি বলে!

ঠিকই বলি। গিরীশকে আপনি যা বলিয়েছেন সে তাই বলে গেছে।

ঠাকুর হাসলেন।

শোন, তোমার রামের কথা শোন। তবে গিরীশের বাড়ি আর যাব না।

তার পরেই বললেন,—রাম, গাড়ি আনতে বলো। নরেন তুইও সঙ্গে চল্।

ঠাকুর চললেন গিরীশের বাড়ি।

শ্রীমা বলতেন, সে জন্মে ঠাকুর এসেছিলেন জগাই-মাধাই উদ্ধার করতে, এবার এসেছেন গিরীশকে উদ্ধার করতে।

উদ্ধার করলেন বইকি। গিরীশের পাপ-তাপ নিজের কাঁধে টেনে নিলেন। গিরীশ মুক্তি পেল। ভক্তি থাকলেই মুক্তি।

শিব-সংক্রান্তির মেলা। মা গঙ্গা নেমে এসেছেন কাশীতে। গঙ্গার পারে লোকের মেলা। স্নান করে পুণ্য সঞ্চয় করবে। বুকে ছ পাই ন পাই লুকিয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে পুণ্য করবে। এক মাতাল উঠে এসেছে বেশ্যা বাড়ি থেকে। লোকের ভীড় দেখে খেয়াল হলো, আজ সংক্রান্তি স্নান। গঙ্গায় ডুব দিলে সব পাপ দূর হবে।

মাতাল চলল স্নান করতে। পথের মাঝে থমকে দাঁড়াল। পথ আটকে বসে আছে একজন মরা স্বামীর মাথা কোলে করে। মতাল বলল,—কি মা, পোড়াবার লোক জুটছে না? চল আমি নিয়ে যাচ্ছি।

ছুঁয়ো না! নিষ্পাপ লোক ছাড়া অন্য লোক ছুঁলে মাথা খসে পড়বে।

মাতাল থমকে দাঁড়াল। পাপ সে তো আর কম করে নি। মদ, মেয়ে, দাঙ্গা সব কিছুই করেছে। একটু ভেবে বলল,—ঠিক আছে, তুমি বসো। আমি গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসি।

মাতাল দৌড়াল গঙ্গার ঘাটে।

ফিরে এসে দেখে কেউ নাই।

গঙ্গা বললেন মহাদেবকে এই একটিমাত্র লোক আজ সংক্রান্তি স্নানের ফল পাবে।

গিরীশ ঘোষও পেয়েছিলেন। ঠাকুরভক্তির গঙ্গায় ডুব দিয়ে নিষ্পাপ হয়েছিলেন।

দাঁতন ফুরিয়ে গেছে। ঠাকুর মালিকে দাঁতন এনে দিতে বললেন। মালি তিনচারটি দাঁতন কেটে আনল।

শালা! তোকে আনতে বললাম একটা আর তুই অতগুলি নিয়ে

এলি ? তুই কি একটা ডাল বানাতে পারিস যে পট পট করে ডাল ভাঙ্গিস ?

একদিন হৃদয় ঝাঁজিয়ে উঠল, তুমি সর তোমাকে আর তরকারি কুটতে হবে না। ঐটুকুন তরকারি তুমি কার পাতে দেবে ?

অর্ধেক রাতে উঠে ঠাকুর তরকারি কুটছেন।

তোদের আর কি বল ! ঠাকুর বললেন, অপচয় করতে পারলেই হলো। ঠাকুর বলতেন, অপচয় করো না সঞ্চয় করো। সঞ্চয় লক্ষ্মী।

সবাইর সঙ্গে পারেন ঠাকুর পারেন না শুধু হৃদয়ের সঙ্গে।

একদিন রেগে এমন সব কথা বললেন যে, হৃদয় কানে হাত দিয়ে বলল, ও মামা, ওসব কথা আমাকে বলতে নাই। আমি তোমার ভাগ্নে।

কখন কখন ঠাকুর হাতের কাছে যা পান তাই দিয়ে হৃদয়ের পিঠে কয়েক ঘা বসিয়ে দেন !

হৃদয়ের কি খেয়াল হলো কুমারী পূজো করবে।

মথুরবাবুর নাতনীকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করল।

খবর শুনে ত্রৈলক্য বিশ্বাস চটে গেল। মন্দিরের কাজটি গেল হৃদয়ের।

রাখতুরামকে ঠাকুর ডাকেন, লাটু, লেটো।

লাটুকে বাংলা পড়াচ্ছেন।

বল, ক।

লাটু বলে কা।

কা নয়রে ক।

কা। ছাপরা জেলার জিভে ক উচ্চারণ হয় না।

কা নয়রে শালা ক।

কা—

দূর শালা ক'কেই যদি কা বলিস্ কা'-কে তবে কি বলবি? যা শালা তোর এসব করে কাজ নাই।

লাটু ছুটি পায়।

রাখতুরামের বাড়ি ছাপরা জেলায়।

মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে বেড়াত আর গান করত। চাচাজির কিছু ক্ষেতিবাড়ি আছে। দিন চলে যায়। গাঁয়ের মহাজন একদিন চাচাজির সম্পত্তি নিলাম করে নিল। ভাগ্যের সন্ধানে চাচাজি রাখতুরামকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলো। বড়া সহর কলকাত্তা, গেলেই কাজ মিলবে।

দেশোয়ালী ভাইয়া ফুলচাঁদের কাছে এসে উঠল। ফুলচাঁদ মেডিকেল কলেজে রামদত্তের আরদালি।

রামদত্ত রাখলেন রাখতুরামকে। নামটা ছোট করে নিয়ে ডাকেন লালটু বলে। লালটু একদিন রামদত্তের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর এলো।

ঠাকুর বললেন, কেরে তুই তোর নাম কি? কার সঙ্গে এসেছিস?

রামদত্ত বললেন, আমার লোক।

এর শরীরে সাধুর লক্ষণ আছে।

লালটু ঠাকুরের কৃপা পেল।

ঠাকুরের হাত ভেঙ্গেছে। দেবেন্দ্র মজুমদার এসেছেন কলকাতা থেকে।

কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

কলকাতা।

দেখতে এসেছ না এমনি?

আপনাকে দেখতে এসেছি।

আমার আর কি দেখবে বল! পড়ে গিয়ে হাত ভেঙ্গেছে।

আজ্ঞে সেরে যাবে।

ঠাকুর খুশ। সদাশিব অল্পেতেই তুষ্ট।

অন্ধকার থাকতেই ঠাকুর রোজ উঠে পড়েন।

নবতঘরের কাছে এসে হাঁক দেন।

ওরে লক্ষ্মী ওঠ—তোর খুড়িকে তোল।

শীতের রাতে এক একদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না সারদার। বলেন, চুপ করে থাক লক্ষ্মী সাড়া দিস না।

সাড়া না পেলে ঠাকুর দরজার ফাঁক দিয়ে বিছানায় জল ছিটিয়ে দেন!

পঞ্চবটির কাছে লাটু ধ্যানে বসে আছে।

—এই লেটো কার ধ্যান করছিস ?

লাটু লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

যা যা নবতঘরে যা, সেখানে সাক্ষাৎ ভগবতী বসে আছেন। রুটি বেলে দে যেয়ে।

লাটুর সঙ্গে নরেনের দেখা হল।

তোদের ওখানের খবর কি লাটু ?

কাল তো বহুৎ কিছু হলো। আপনি তো গেলেন না। আজ হামার সাথমে চোলেন।

ভাগ। নরেন বলল, আমার আর কাজ নাই, এখন সেই পাগলা বামুনের কাছে ছুটি!—

পাগলা!--লাটু বলল, পাগলা কিসকো কহতে হেঁ!

আর কাকে!—যার কোমরে কাপড় থাকে না। নাম শুনলে যে ধেই ধেই করে নাচে। সব ভেলকি, বুঝলি ?

ভেলকি!

হ্যাঁ রে হ্যাঁ! সে সব তুই বুঝবিনা। রাখাল ওখানে যায় ?

শুধু যায় না, থাকে।

রামদত্ত নালিশ করলেন, সুরেশ মিত্তির মদ খায়।

তাতে তোর কি ? ঠাকুর বললেন, ওর ধাত আলাদা।

সুরেশ মিত্তির রামদত্তকে বলল, তুই কত্তামো করিসনে। চল প্রভুর কাছে, তিনি যা বলেন তা হবে।

খাবার আগে গ্রাস নিবেদন করে মাকে বলে, মা বিষটুকু তুইনে, মদটুকু আমি খাই। তার পরেই সুরেশ মিত্তির গান আর ঠাকুরের নাম করে।

অভিমান হয়েছে সারদার। ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

ওরে রামলাল, তোর খুড়িকে শান্ত কর। ও রাগলে ব্রহ্মা বিষ্ণুও আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

ঠাকুর বলেন, আগে আমার কাপড় ঠিক থাকত না। এখন সব ঠিক থাকে।

ভক্তেরা বসে আছে। ঠাকুর এলেন। পরবার ধুতিটি বগলদাবা।

দেখ তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল, তোদের পাল্লায় পড়ে আমিও সভ্য হয়েছি। আজকাল সব সময় দেখবি আমি ফিটফাট,— ধুতিপরা।

এই আপনার কাপড় পরা?

মাইরি বলছি, আমি সভ্য হয়েছি।

গা ছুঁয়ে ভক্তরা বুঝিয়ে দিল ঠাকুর কাপড় পরেন নি।

ঠাকুর বললেন, মনে করি তো সভ্য হব। কিন্তু মহামায়া যে বসন রাখতে দেন না!

ভবতারিণী দর্শন করতে গেছেন ঠাকুর। ফিরে এলেন টলতে টলতে।

ওগো, আমি কি মাতাল হয়েছি? মদ খেয়েছি?

না। সারদা বললেন, তুমি মা কালীর ভাবামৃত পান করেছ।

ঠিক হলেন ঠাকুর। ঘোর কেটে গেল।

সিমলা ষ্ট্রীটে সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর।

এখানে কেউ ভজন গাইতে পারে?

পারে একজন। সুরেশ মিত্তির বলল, আমি তাকে ডেকে আনছি।

নরেনকে ডেকে আনল সুরেশ মিত্তির।

ঠাকুর চমকে উঠলেন। এযে সেই ঋষি!

অপূর্ব দর্শন হয়েছিল ঠাকুরের।

সমাধি অবস্থায় উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছেন। জ্যোতির্ময় পথ ধরে চলতে চলতে পার হলেন পৃথিবী, পার হলেন জ্যোতিষ্কমণ্ডল। পথের দুধারে বসে আছেন দেব-দেবীরা। আরো উর্দ্ধে উঠতে লাগলেন। ভাব রাজ্যের চরম সীমায় এসে থামলেন। একটি জ্যোতিরেখা দুটি বিশাল রাজ্যকে পৃথক করে রেখেছে। খণ্ড আর অখণ্ডের রাজ্য। অখণ্ড রাজ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে দেব-দেবী নাই। দিব্য দেহের অধিকারি হয়েও তাদের এখানে আসবার অধিকার নাই। সেই অখণ্ড লোকে সাতজন ঋষির বাস। আশ্চর্য হলেন দেখে। যেখানে দেব-দেবী আসতে পারে না, সেখানে এঁরা এলেন কি করে? বুঝলেন জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতায় এরা দেব-দেবীরও শ্রেষ্ঠ। হঠাৎ দেখতে পেলেন, অখণ্ড লোকের জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কিছুটা অংশ ঘন হতে হতে এক দেবশিশুর আকার নিল। শিশুটি একজন ঋষির গলা জড়িয়ে ধরল। ঋষির ধ্যান ভেঙ্গে গেল। শিশু ঋষিকে বলল, আমি চললাম, তুমি এসো। ঋষিও আবার ধ্যানস্থ হলেন। ঋষির দেহ থেকে জ্যোতির রেখা আলোক বর্তিকার মত পৃথিবীর দিকে নেমে গেল।

ঠাকুর নরেনকে দেখে চমকে উঠলেন। এ সেই ঋষি আর নিজে সেই শিশু।

সুরেশ মিত্তির নতুন গাড়ি কিনেছে। রামদত্তের মাহিনা বেড়েছে। সবই নাকি ঠাকুরের কৃপায়। শুনে নরেন হাসে।

সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে এলে ছেলে-ছোকরা ভীড় করে আসে।

একজন উঁচুদরের সরকারী চাকরে বসেছিল সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে। ঠাকুরকে প্রশ্ন করল।

ঠাকুর বললেন, তুমি কি কর?

আপনার মত ছেলে বকাই না, জগতের হিত করি।

যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি কিছু বোঝেন না। তুমি সামান্য মানুষ হয়ে জগতের হিত করছ। ঈশ্বরের চেয়ে তুমি দেখছি বেশি বুদ্ধিমান!

তারপর থেকে সেই সরকারী চাকুরেকে দেখলেই পাড়ার ছেলেরা বলে, কি হে জগতের হিত করছ নাকি, কতটা করলে?

পাড়ার ছেলেরা লাগল সরকারী কর্মচারিটির পিছনে।

নদীর ঘাটে মাঝিরা মারামারি করছে। একজন আর একজনের পিঠে সজোরে চড় মারল।

ঠাকুর আর্তনাদ করে উঠলেন। পিটে ফুটে উঠেছে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ।

হৃদয় ছুটে এলো।

তোমাকে কে মেরেছে মামা? আগুন হয়ে উঠল হৃদয়। নাম বল তাকে দেখে নিচ্ছি।

ঠাকুর বললেন, কেউ না। এক মাঝি আর এক মাঝিকে মেরেছে। সেও তো আমাকেই মারা।

কালীবাড়ির বাগানে নতুন ঘাস উঠেছে। কেউ সে ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে গেল ঠাকুর চীৎকার করে ওঠেন, ওরে হাঁটিস না, হাঁটিস না আমার লাগে।

কামারপুকুরে শ্রীমাকে খবর পাঠালেন ঠাকুর।

এখানে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। রামলাল মা কালীর পূজারী হয়ে আমার আর খবর নেয় না।

সারদা এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুর ঠিক করে দিয়েছেন, রাখাল খাবে ছখানা, লাটু পাঁচ খানা বুড়ো গোপাল আর বলরাম খাবে চারখানা করে রুটি।

একদিন ধরে বসলেন বাবুরামকে।

কখানা করে রুটি খাচ্ছিসরে বাবুরাম ?

পাঁচ ছ'খানা।

ঠাকুর এসে হাজির নবতঘরে।

তুমি বেশি করে খাইয়ে খাইয়ে ছেলেগুলোর আখের মাটি করবে দেখছি।

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী এসে দেখল ঠাকুরের বিছানা ময়লা।

বলল, আমি দশহাজার টাকা দেব বাবা, তার সুদ থেকে তোমার সেবা চলবে।

ও রকম কথা আর বলো না। ঠাকুর বললেন, যদি বল তবে এখানে আর এসোনা।

মাড়োয়ারী বলল, তবে হৃদয়ের কাছে যাই !

ঠাকুর বললেন, না ওর নেয়া মানেই আমার নেয়া।

একটু পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা হলো ঠাকুরের। মাড়োয়ারীকে নবতঘর দেখিয়ে দিলেন।

যেমন রামকৃষ্ণ তেমন সারদা।

শ্রীমা মাড়োয়ারীকে বিদায় করে দিলেন।

ছোট একটি তক্তপোষে বসে আছেন ঠাকুর।

বললেন, বুঝলে, হাজার বিচার কর তবু তাঁর আন্ডারে আমরা আছি। মাষ্টার মশাই বললেন, তার আমি আন্ডারে শিখলাম।

নরেন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুর বললেন, আর আসিস না কেন রে ? একটা গান শোনা।

নরেন গান শোনাল।

থামতেই বললেন, আর একটা গা।

নরেন গান ধরল। মন চল নিজ নিকেতন।

ঠাকুর হাত ধরে নরেনকে নিয়ে এলেন বারান্দায়। নরেন ভাবল, বোধহয় উপদেশ দেবেন।

হ্যাঁরে, তোর কি দয়ামায়া নাই? বিষয়ী লোকের কথা শুনে কানে কড়া পড়ে গেল। এত দেরি করে আসতে হয়?

নরেন চুপ করে তাকিয়ে আছে।

মাকে সেদিন অনেক করে বললাম, মাগো ভক্ত না পেলে থাকব কেমন করে? তারপর কি হলো জানিস? কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝরাতে তুই এসে ঠেলে তুলে দিলি?

কই আমি তো কিছু জানি না!

তা বইকি। ঠাকুর হাতজোড় করে বললেন, আমি জানি প্রভু তুমি কে? তুমি সেই পুরাণ ঋষি, তুমি মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষ। তুমি নররূপী নারায়ণ। তুমি আমার জন্য রূপ ধারণ করে এসেছ।

নরেন ভাবে, পাগল। প্রলাপ বকছে। কিন্তু তবু যেন এ কথা উড়িয়ে দিতে মন সায় দেয় না।

তুই একটু বোস তোর জন্য খাবার নিয়ে আসি।

ঠাকুর নরেনকে খাইয়ে দিলেন।

বল আবার আসবি? আসবি তো? এবার যখন আসবি একা আসবি।

নরেন ঠাকুরকে ভাল করে দেখতে লাগল। পাগল কি অত সদালাপ করতে পারে? পাগলের কি ভাব সমাধি হয়? পাগল কি ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়?

বাড়ি ফিরল নরেন।

নরেন মনকে বোঝাতে চেষ্টা করে। লোকটি বদ্ধ পাগল। না হলে বলে কিনা ঈশ্বরকে দেখা যায়!

আবার এলো দক্ষিণেশ্বরে। যতই ভাবুক। কিন্তু সেই পাগলের আকর্ষণেই আবার এলো।

ঠাকুর খুশি হলেন।

পাশে বসিয়ে বললেন, কিছু খাবি ?

সরে বসল নরেন। ঠাকুরও সরে আসলেন।

না জানি আবার অদ্ভুত কি কাণ্ড করে বসে। একটু ভয় পেল নরেন।

কিছু বুঝবার আগেই ঠাকুর ডান পা নরেনের গায়ের উপর তুলে দিলেন।

মুহূর্তে কি হয়ে গেল! ঘর, বাড়ি, দশদিক, দৃশ্যমান সব কিছুই যেন ঘুরতে ঘুরতে শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে লাগল।

নরেন কেঁদে উঠল, এ কি করলে, আমার যে বাবা মা বেঁচে আছেন।

হেসে উঠলেন ঠাকুর।

তাই নাকি!—যখন তোর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় তখনও জানতে চেয়েছি তোর বাপ মায়ের কথা। আচ্ছা এখন থাক, আস্তে আস্তে হবে।

নরেন ভাবল লোকটি সম্মোহন বিদ্যায় ওস্তাদ।

শশধর পণ্ডিতকে দেখতে গেলেন ঠাকুর। সঙ্গে নরেন।

হঠাৎ পিপাসা পেল।

বললেন, জল খাব।

গৃহস্থ যদি সাধু সন্ন্যাসীকে নিজে থেকে কিছু না দেয়, তবে চেয়ে িতে হয়।

এক তিলক-কাটা ভক্ত গ্লাসে জল নিয়ে এলো।

ঠাকুর খেলেন না। সকলে ভাবল বোধ হয় জলে নোংরা ছিল। আর একজন ভক্ত জল নিয়ে এলো। এবার ঠাকুর খেলেন।

নরেন লক্ষ্য করেছে! ভাবল ভিতরে কিছু রহস্য আছে। ঠাকুর চলে গেলে নরেন তিলকধারীর ছোট ভাইকে খুঁজে বার করে প্রশ্ন করল, তোমার দাদার স্বভাব চরিত্রটি কেমন হে?

ছোটভাই মুচকি হেসে বলল, ছোট ভাই হয়ে দাদার কথা আর বলি কি করে বলুন!

নরেন বুঝল ঠাকুর কেন জল খান নি।

কিন্তু ঠাকুর বুঝলেন কি করে?

ভগবতী ঝি এসে দূর থেকে ঠাকুরকে প্রণাম করল।

ঠাকুর বললেন, এখন তো বয়স হয়েছে। টাকা পয়সা আছে এবার সাধু সন্ন্যাসীদের একদিন ভোজ দে।

তা আর বলি কি করে!

কাশী বৃন্দাবন দেখে এলি?

কই আর হলো?

তা হলে আর করলি কি?

একটা ঘাট বাঁধিয়েছি। আমার নাম লেখা আছে।

ভগবতী হঠাৎ ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

ঠাকুর যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন। ঘরের কোণে ছিল গঙ্গাজল। সে দিকে ছুটে গেলেন।

বরাহনগরে বেড়াতে এসেছে মহেন্দ্র গুপ্ত। মেট্রোপলিটন স্কুলের হেড মাষ্টার।

বন্ধু সিদ্ধেশ্বর বলল, চল, দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির বাগানে একজন সাধু পুরুষ আছেন দেখবে চল।

মহেন্দ্রকে দেখে ঠাকুর বলে উঠলেন, তুমি এসেছ? আচ্ছা কেশব কেমন আছে বলতে পার? শুনছি তার খুব অসুখ?

আমিও শুনেছি।

তোমার কি বিয়ে হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হয়েছে! যেন যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন ঠাকুর।

ছেলে হয়েছে?

আজ্ঞে একটি হয়েছে।

যাঃ!—ছেলেও হয়েছে! আর কি হবে! তোমার মধ্যে ভাল লক্ষণ ছিল। আচ্ছা তোমার পরিবারটি কেমন?

আজ্ঞে ভাল, তবে অজ্ঞান।

আর তুমি বুঝি মস্ত একজন জ্ঞানী? বিরক্ত হয়ে ঠাকুর বললেন, শোন অনেক জানার নাম অজ্ঞান, এক জানার নাম জ্ঞান।

॥ বার ॥

জায়গাটার অর্দ্ধেক হেষ্টিংস সাহেবের, অর্দ্ধেক মুসলমানদের কবর আর গাজিপীরের স্থান।

জানবাজারে রাণী রাসমণি, ঠাকুর বলতেন অষ্টসাধিকার একজন—শিব শক্তি স্থাপন করবেন। কাশী যেতে যেতে নৌকা ঘুরিয়ে ফিরে এসেছেন। স্বপ্নে আদেশ পেয়েছেন, গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসীর সমতুল, সেখানেই করবেন মন্দির স্থাপন। খুঁজে পেলেন এই জায়গা। রাণীর পছন্দ হ'ল। সাধন ভজনের জন্য সাধুরা যেমন চান তেমনি। যেন পিঠ ছড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড কাছিম পড়ে আছে।

রামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করলেন দক্ষিণেশ্বরে।

হৃদে গঙ্গামাটি এনে দেয় আর ঠাকুর শিব বানান।

আমলকি তলায় একদিন বসে ঠাকুর শিবমূর্তি গড়ছেন। মথুরবাবু দেখলেন সে মূর্তি। বললেন, আমাকে দিন।

ঠাকুর মূর্তি তুলে দিলেন মথুরবাবুর হাতে।

বুড়ো কাশীনাথ নাম করা কুমার। সরস্বতীর মূর্তি গড়ছে। গদাধর বসে আছে কাছে।

বলে উঠল, হচ্ছে না তো!

কি হচ্ছে না?

যা বানাচ্ছ।

বেশ, কি রকম হবে দেখাও। কাশীনাথ মূর্তি ছেড়ে সরে গেল। দেখাও কি হচ্ছেনা, কোনটা হচ্ছে না।

চোখ হচ্ছে না। সরস্বতীর চোখ ও রকম ক্যাটকেটে হবে নাকি?

বলে কি বাচ্চা ঠাকুর!

বেশ তুমি করে দেখাও।

গদাধর সরস্বতীর চোখ করে দিল।

কাশীনাথ অবাক।

মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন ঠাকুর।

দেওঘরে এসেছেন। বৈদ্যনাথ দর্শন করে কাশী যাবেন।

দেওঘরে তখন দুর্ভিক্ষ চলছে। সাঁওতালেরা দলে দলে ভিক্ষে করে বেড়ায়।

ঠাকুর বললেন, সেজবাবু তুমি তো মায়ের দেওয়ান। এরাও মায়ের ছেলে। এদের পেট ভরে খেতে দাও, মাথায় তেল দাও, পরবার কাপড় দাও।

মথুরবাবু বললেন, এই পথের মাঝে আমি কোথায় টাকা পাব? তীর্থে বেরিয়েছি, কখন কোথায় কি লাগে, ব্যবস্থা রাখতে হবে। হাতের টাকা এখানে খরচ করলে চলবে কি করে?

তবে তোমরা যাও। ঠাকুর বললেন, আমি থাকব।

মথুরবাবু বিপদে পড়লেন!

মনে মনে বললেন, যা কর ঠাকুর তুমি করবে। তুমি যখন সঙ্গে আছ ভাবনা কি।

মথুরবাবু দানছত্র করলেন।

গলায় ঘা হয়েছে ঠাকুরের তবুও কথার বিরাম নাই।

নাগমশাইকে ঠাকুর বললেন, দুর্গাচরণ ডাক্তার তো পারলে না। তুই পারিস আমাকে সারাতে?

পারি।

নাগমশাইয়ের মনে পড়ল যযাতির কথা। মনে পড়ল বাবরের কথা। তাই বললেন, পারি।

ভক্তেরা বলল, পারেন?

নিশ্চয় পারি।

নাগমশাই এগিয়ে গেলেন, ঠাকুর ঠেলে সরিয়ে দিলেন।

ওরে না না তাই কি হয়? তুই যা মনে করেছিস তা হবে না। আমি জানি তুই এ রোগ সারাতে পারিস, আত্মবলি দিয়ে এ রোগ সারাবার ক্ষমতা তোর আছে। আমি কি তা তোকে করতে দিতে পারি?

ঠাকুরের অসুখ বেড়েই চলেছে।

ভক্তরা ঠাকুরকে কলকাতায় নিয়ে এসেছে।

শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে আছেন।

কবরেজেরা জবাব দিয়েছে। শাস্ত্রে বিধান থাকলেও এ রোগ শিবের অসাধ্য।

নরেন, রাখাল, নিরঞ্জন, লাটু ঠাকুরের সেবা করে।

একদিন ঠিক করল, পাশের বাগান থেকে খেজুর গাছের জিরেন রস খেতে হবে।

সন্ধ্যে হতেই সবাই সে দিকে গেল।

শ্রীমা দেখলেন ঠাকুর বিদ্যুতের মত নিচের দিকে ছুটে গেলেন। শ্রীমা উপরে উঠে এলেন।

ঠাকুরের বিছনা খালি।

ভয় পেয়ে শ্রীমা খুঁজে বেড়াতে লাগলেন গোটা বাড়ি। যে মানুষকে ধরে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়, সে মানুষ গেলেন কোথায়! একটু পরেই আবার দেখলেন ঠাকুর বিছানায় শুয়ে আছে।

শ্রীমা কথাটা পাড়লেন।

ঠাকুর উড়িয়ে দিলেন।

শ্রীমা ছাড়লেন না। বললেন, আমি, দেখেছি, তুমি উড়িয়ে দিলে কি হবে?

তুমি দেখে ফেলেছ? ঠাকুর বললেন, কাউকে বলো না। ছেলেবা রস খেতে গিয়েছে ঐ খেজুর গাছে। ঐ গাছের তলায় কালসাপ আছে। ভারি বদরাগী। দেখলেই তেড়ে এসে কামড়ে দেয়। ছেলেদের সামনে পেলে ওদেরও কামড়ে দিত। তাই অন্য পথ দিয়ে যেয়ে সাপটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম। বলে এলাম আর কখনও এখানে আসবি না।

ঠাকুর বলতেন, নরেন আমার জাত পুরুষ। সেই নরেন যাবে এমেরিকা। মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। ঠাকুর নাই। স্বপ্ন দেখল, ঠাকুর সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর নরেনকে ইশারায় অনুসরণ করতে বলছেন।

নরেনের সব সংশয়, সব দ্বন্দ্ব কেটে গেল।

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুরের জল খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

ঠাকুরের মহাভাবনা। যাকে দেখেন তাকেই বলেন, হ্যাঁ গো, আমি জল না খেয়ে বাঁচব কি করে?

জলের বদলে ঠাকুর দুধ খান। আধসের দুধ আর কতটুক।

গয়লা বলল, আমি ঠাকুরের দুধ যোগাব। যতদুধ লাগে, ঠাকুরের যেন কষ্ট না হয়। ছয় সের দুধ দেয় গয়লা। শ্রীমা জ্বাল দিয়ে কমিয়ে দেন। ঠাকুর রোজই জানতে চান, কত দুধ খাচ্ছেন?

কত আর পাঁচপো, একসের। শ্রীমা বলেন।

গোলাপ-মা ফাঁস করে দিলেন।

ঠাকুর চমকে উঠলেন। এ্যা! এত দুধ। তাই তো আমার পেট গড়গড় করে। ডাকো সারদাকে কত দুধ আমাকে খাওয়াচ্ছে?

কত আর, সামান্য।

তবে যে গোলাপ-মা বলল অনেক।

গোলাপ-মা কি জানে! শ্রীমা বললেন, এখানকার মাপ ও বুঝবে কি?

ঠাকুর শান্ত হলেন।

ঠাকুর প্রশ্ন করলেন, কটাকা হলে তোমার চলে।

এ আবার কি কথা! ঠাকুরের কথা শুনে শ্রীমা লজ্জায় মুখ নামালেন।

ঠাকুর বললেন, কখানা রুটি খাও?

আরো লজ্জায় পড়লেন শ্রীমা। উত্তর না দিলে ঠাকুর হয়ত আরো এমন প্রশ্ন করে বসবেন,—আরো লজ্জায় পড়তে হবে।

বললেন, পাঁচ ছ'খানা।

তবে আর কি! ঠাকুর বললেন, মাসে পাঁচ টাকা হলেই তোমার চলে যাবে।

শুয়ে আছেন ঠাকুর।

দরজা খুলে কে যেন ভিতরে এলেন।

ঠাকুর ভাবলেন, লক্ষ্মী।

বললেন, যাবার সময় দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যাস।

আচ্ছা।

ঠাকুর রাগ করেছেন শুনে শ্রীমা কেঁদে ফেললেন। চলে এলেন কলকাতা।

তুমি নাকি আমার উপরে রাগ করে চলে এসেছ?

সে কি! কে বলেছে একথা?

গোলাপ-মা।

একথা বলে গোলাপ মা তোমাকে কাঁদিয়েছে? ডাকো, কোথায় সে ডেকে আন। ঠাকুর অসন্তুষ্ট হলেন। মা শান্ত হলেন। ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুর বলতেন,—

সন্দেশের গুঁড়ো পড়লে পিঁপড়ে এসে আপনি জোটে।

ফলবান বৃক্ষ নুয়ে পড়ে।

কে কার গুরু? ঈশ্বর সকলের গুরু।

যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।

স্ত্রীলোক মাত্রই ভগবতীর অংশ।

বিদ্যায় বুদ্ধি শুদ্ধি করে।

যে বাড়িতে হরি-সংকীর্তন হয়, সেবাড়িতে কলি প্রবেশ করতে পারে না।

যার বিশ্বাস আছে তার সব আছে।

উঁচুতে উঠলে সব কিছুই সমান দেখায়, ঈশ্বর পেলে ভালমন্দ উঁচু নীচু থাকে না।

ঈশ্বরে মন কি করে হয়?

ঈশ্বরের নাম ও গুণগান সর্বদা করতে হয়, সৎসঙ্গ করতে হয়, ঈশ্বর ভক্ত বা সাধুসঙ্গ করতে হয়। মাঝে মাঝে নির্জনে বসে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়। প্রথম অবস্থায় নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা কঠিন। গাছ যখন চারা থাকে তখন চারদিকে বেড়া দিতে হয়।

ধ্যান করবে মনে, কোণে আর বনে।

গলা শুনে ঠাকুর তাকালেন,—লক্ষ্মী নয় সারদা।

তুমি! কিছু মনে করো না, লক্ষ্মী ভেবে তুই বলে ফেলেছি।

সারারাত ঠাকুরের ঘুম হলো না। ভোর হতেই নবতঘরের দরজায় হাজির।

দেখগো, কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি। ভাবছি কেন এ রকম বললাম!

গোলাপ-মা যোগেন-মাকে বলল, দেখ যোগেন, আমার মনে হয় ঠাকুর বোধ হয় মার উপর রাগ করে কলকাতা চলে গেছেন।

যোগেন-মা প্রতিবাদ করল, সেকি কথা! ঠাকুর তো চিকিৎসা করতে গেছেন।

গোলাপ-মা বলল, বাইরে থেকে তাই মনে হয়।

সংসারে কি রকম করে থাকতে হবে?

পাঁকাল মাছের মত। কাদায় থাকবে, গায়ে কাদা মাখবে না।

ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়।

ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি করবে। দুষ্ট লোক থেকে দূরে থাকবে। বাঘের মধ্যেও নারায়ণ আছেন, ছাগলের মধ্যেও আছেন, ডাকাতের মধ্যেও আছেন, সাধুর মধ্যেও আছেন।

জীবনে উদ্দেশ্য কি?

ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

কোন্ কাজের দ্বারা ঈশ্বর পাওয়া যায়?

সবই তাঁর কৃপার উপরে নির্ভর করে। ব্যকুলতা থাকলে সব হয়।

কোন্‌টা সৎ? কোন্‌টা অসৎ?

সাধনা করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন কোন্‌টা সৎ কোন্‌টা অসৎ।

যত্র জীব তত্র শিব।

অষ্টসিদ্ধাই পেলেন ঠাকুর।

হৃদয় বলল; মামা শক্তি পেলে এবার কাজে লাগাও।

ঠাকুর বলেন, বিষ জ্ঞানে এসব এড়িয়ে চলবি।

নরেন বলল, আমার কি হয়েছে! চোখ বুজে বসলেই দূরের জিনিস দেখতে পাই।

ঠাকুর বললেন, ধ্যান বন্ধ কর।

ঠাকুরের উপরে বিবেকানন্দের অভিমান হয়েছে।

শ্রীমাকে বললেন, মা এইতো ঠাকুর! সামান্য একটা ফকিরের শক্তি ঠেকাতে পারেন না।

কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আসত আমার কাছে। ফকির রাগ করে আমাকে শাপ দেয়, তিন দিনের মধ্যে পেটের ব্যারামে আমাকে কাশ্মীর ছাড়তে হবে। তাই হলো পেটের অসুখ হয়ে তিন দিনের মধ্যে আমি কাশ্মীর ছেড়ে পালিয়ে আসি।

শ্রীমা বললেন, তাতে কি হয়েছে বাবা! তোমার শরীরে রোগ আসাও যা ঠাকুরের শরীরে আসাও তা। শঙ্করাচার্যও নাকি এমনি করে নিজের শরীরে অসুখ টেনে নিয়েছিলেন। তিনি গড়তে এসেছিলেন, তাই সব মেনে গিয়েছেন।

বিবেকানন্দ বললেন, আমি ওসব মানিনা।

না মেনে কি উপায় আছে বাবা! তোমার টিকি যে বাঁধা।

গিরীশ ঘোষও একদিন বলেছিল।

ইচ্ছে হয় সব ছেড়েদি। লেখাপড়া অভিনয় কিছু করব না।

না ছেড়ো না, ঠাকুর বললেন, ওতে লোকের উপকার হচ্ছে।

রাগকে দমন করতে হবে প্রেমে—

অক্রোধেন জিনেৎ ক্রোধম—গিরীশ ঠাকুরকে গালাগাল দিয়েছে। পরের দিন ঠাকুর গেলেন গিরীশের কাছে।

তোমাকেই দেখতে এলাম গিরীশ। এখন কেমন আছ?

বেড়াতে বেরিয়ে পথের উপরে পতিতাদের দেখে প্রণাম করেন, যা দেবী সর্ব ভুতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা। এদের মধ্যেও যে তিনি আছেন।

ঠাকুর দেখলেন তাঁর দেহ থেকে আর একটি দেহ বেরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিঠে ঘা কেন? কিসের ঘা? ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হলেন।

পাপীদের স্পর্শে ঘা হয়েছে।

গলায় ঘা। অসীম যাতনা। ঠাকুর বললেন, একদিন দেখলাম পিঠময় ঘা। মা বললেন. যাতা লোক এসে স্পর্শ করে, তাদের পাপের ফল তোকে ভোগ করতে হবে। তোকে ছুঁয়ে যারা উদ্ধার হয়ে গেল, তাদের পাপের ফল যাবে কোথায়? তোকেই ভোগ করতে হবে। কিন্তু কি করব বলো! মানুষতো? যা করেই আসুক ফিরিয়ে দিতে পারি না।

ভক্তরা ঠিক করল, এবার থেকে বাইরের লোককে আর স্পর্শ করতে দেয়া হবে না।

গিরীশ বলল, তাকি পারবে? ঠাকুর এসেছেন পাপী উদ্ধার করতে।

শিয়ড় গাঁয়ে রাখালদের সঙ্গে জলপান ভাগ করে খেতেন ঠাকুর। ছুতোরের মেয়ে খেতুর মার সাধ মেটাতে ডাল ভাত খেয়েছেন। ঠাকুরবাড়ির রসিক মেথর তার সেবাও ঠাকুর নিয়েছেন।

হলই বা ব্রাহ্মণেতর জাতি! কিন্তু মানুষ তো? জীবন্ত শিব। যত্র জীব তত্র শিব। নর নারায়ণ জীবো ব্রহ্মব না পরঃ। জীবই ব্রহ্ম।

গুরু তোতাপুরীকেও ঠাকুর ঠাট্টা করেছেন।

হাসছি তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের বহর দেখে। তুমিই বল ব্রহ্ম বই

দ্বিতীয় সত্তা নাই। জগতে সব কিছুতেই তাঁর প্রকাশ। আর রাগের বশে তুমি সব ভুলে চিমটে নিয়ে ছুটলে মারতে!

ঠাকুর ডেকে পাঠালেন নরেনকে।

নরেন কাশীপুর যায় বারবার, ঠাকুরের কাছে নির্বিকল্প সমাধি লাভের বাসনা জানায়।

ঠাকুর বলেন,—দাঁড়া আগে আমি ভাল হয়ে উঠি।

আপনি যদি ভাল না হন তবে কি হবে?

নরেনের কথায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন ঠাকুর। শালা বলে কি! আচ্ছা তুই কি চাস্?

ক্রমাগত সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই।

ছিঃ ছিঃ, তোর মুখে একথা! তুই হবি বটগাছ! তোর ছায়ায় হাজার লোক আশ্রয় নেবে।

একদিন নরেনের নির্বিকল্প সমাধি হলো।

ধ্যানের মধ্যে চীৎকার করে উঠল,—আমার শরীর কোথায়?

কেউ কিছু বুঝতে পারে না। ঠাকুর বললেন,—বেশ হয়েছে। থাক শালা ও ভাবে কিছুক্ষণ। আমাকে বড় জ্বালাতন করত।

দেহ রাখবার কয়েকদিন আগে নরেনকে ডেকে এনে কাছে বসালেন। নরেনের মনে হলো বিদ্যুতের মত একটি তেজশিখা ঠাকুরের দেহ হতে বেরিয়ে তার শরীরে প্রবেশ করল।

নরেন জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফিরে এলে ঠাকুর বললেন,—আজ তোকে সব দিয়ে আমি ফতুর হলাম। এবার আমার ছুটি।

একদিন বললেন,—দেখ্ নরেন, তোর হাতে এদের দিয়ে যাচ্ছি। এদের ব্যবস্থা করবি।

নরেন বলল,—আমি ওসব পারব না।

পারবি না মানে! ঠাকুর বললেন,—তোর ঘাড় পারবে। এখনও তোর জ্ঞান হল না—যে রাম সে কৃষ্ণ, এ শরীরে সেই রামকৃষ্ণ।

নরেনের মনে কোন দুর্বলতা নাই।

এক বাগানবাড়িতে নরেনের বন্ধু নরেনকে নিয়ে গেছে। সেখানে মদ আর মেয়েমানুষের ব্যবস্থা করে রেখেছে।

নরেন সেই বারবনিতাকে এমন সব প্রশ্ন করল যে সেই বারবনিতা লজ্জা ও দুঃখে মুখ নিচু করল।

এ অভিজ্ঞতা তার কাছে নতুন। যাদের সে সঙ্গ দেয়, তাদের মুখে এমন দরদভরা প্রশ্ন কখন শোনেনি।

ঠাকুর সবই শুনলেন।

বললেন, জানি জীবনে ওর নারী সঙ্গ হবে না।

নরেনের বাবা মারা গেছেন। অর্থাভাব।

ঠাকুরের কাছে গেল।

বলুন এখন আমি কি করব? কোন আশাই দেখতে পাচ্ছি না। আপনি আমার হয়ে মা কালীকে একটু বলুন।

ঠাকুর বললেন, তুই যা মন্দিরে যেয়ে নিজে প্রার্থনা জানা।

নরেন মন্দিরে গেল।

বাইরে আসতে ঠাকুর বললেন, কিরে মাকে বলেছিস্?

না ভুলে-গেছি।

আবার যা।

বারবার তিনবার গেল নরেন, কিন্তু প্রার্থনা জানান হলো না।

ঠাকুর বললেন, যা মায়ের ইচ্ছায় তোর মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।

তুমি এসেছো?

ঠাকুর শ্রীমাকে দেখে খুশি হয়ে উঠে বললেন।

তোমাকেই মনে মনে চাইছিলাম। বলেই হাঁক দিলেন, ওরে একটা মাদুর পেতে দিয়ে যা।

সারদা বসলেন।

এখন কি আর মেজবাবু আছেন? আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। সে থাকলে তোমাকে অট্টালিকায় রাখতো।

সারদাকে দেখতে আসে মেয়েরা। কালো মেঘের মত জমাট বাঁধা চুলের গোছা নেমে এসেছে পা পর্যন্ত। চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি পরে থাকেন। গলায় সোনার হার। হাতে চুড়ি।

মেয়েরা আপশোস করে এমন মেয়ের সংসার হলো না!

ঠাকুর বলেন, ওদের কথায় দুঃখ পেয়ো না। ওরা সব হাঁস। পুকুরের চারদিকে প্যাঁক প্যাঁক করে ঘুরে বেড়ায়। ওরা বলবে আমার মন ফেরাতে ওষুধ করতে। দেখো তুমি যেন আবার সে সব করতে যেয়ো না।

সারদা থাকে নবতঘরে।

খেতে বসে ঠাকুর বললেন, আচ্ছা বল দেখি আমার বিয়ে হলো কেন? যার পরণে কাপড় ঠিক থাকে না তার আবার বিয়ে কি? আবার নিজেই উত্তর দিলেন, বুঝেছি তা না হলে এমন করে কে আর রেঁধে দেবে? সব রকম খাওয়া তো আর আমার পেটে সহ্য হয় না। কিন্তু ও বোঝে সব তাই এটা ওটা করে খাওয়ায়।

ঠাকুর বলতেন, কর্ম হচ্ছে লক্ষ্মী। দেখ সীতা রাঁধতেন, পার্বতী রাঁধতেন, দ্রৌপদী রাঁধতেন, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীও রেঁধে খাওয়াতেন সবাইকে।

দরমার বেড়ার আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখে সারদা। বেড়ায় একটি গর্ত করেছে ইঁদুর।

সেই গর্ত দিয়ে দেখে ঠাকুরকে।

ঠাকুর দেখতে পেয়ে বলেছিলেন, ওরে রামলাল তোর খুড়ির পর্দা যে ফাঁক হয়ে গেল!

ঠকুর একটি স্থায়ী বাসিন্দা এনে দিলেন শ্রীমাকে।

নবতঘরের দরজায় এসে ডাক দিলেন, ব্রহ্মময়ী ওগো ব্রহ্মময়ী।

সারদা নয়, ওগো হ্যাগো নয়, ব্রহ্মময়ী!

নাও সঙ্গী চেয়েছিলে, এই নাও গৌরদাসীকে।

বকুলতলায় ফুল কুড়োচ্ছে গৌরদাসী।

ঠাকুর বললেন, গৌরী আমি জল ঢালি তুই কাদা চটকা।

এখানে কাদা কোথায় পাব? সবই তো কাঁকর।

ঠাকুর হাসলেন।

আমি কি বললাম, আর তুই কি বুঝলি। এদেশের মেয়েদের বড় দুঃখ, তুই তাদের মধ্যে কাজ কর।

মাথা ঝাঁকালো গৌরদাসী।

রক্ষে করো বাবা, সংসারী লোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না। তার চেয়ে কতগুলি মেয়েকে নিয়ে হিমালয়ে চলে যাব।

ঠাকুর বললেন, নারে সহরে কাজ করতে হবে। অনেক সাধন ভজন করেছিস এবার মায়েদের কাজে লেগে যা।

ঠাকুর একদিন বললেন, বলতো গৌরী কাকে তুই বেশি ভাল-বাসিস। আমাকে না ওকে?

গৌরদাসী গেয়ে উঠল—

রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী।
লোকের বিপদ হলে
ডাকে মধুসূদন বলে,
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশীতে বল রাইকিশোরী।

ঠাকুর খুশি হলেন।

একদিন কি খেয়াল হলো ঠাকুর নবতঘরে এসে হাজির। বটুয়ায় মশলা নাই, মশলা চাই। দুটি জোয়ান মৌরি দিলেন মা। রাত্রির জন্য কাগজে মুড়ে আরো দুটি মশলা তুলে দিলেন ঠাকুরের হাতে।

মশলার পুঁটলি নিয়ে ঠাকুর নিজের ঘরে ফিরলেন। কিন্তু কেমন যেন বেহুঁস হয়ে আছেন। ঘরে না গিয়ে সোজা চলে গেলেন গঙ্গার ধারে।

মা ডুবি? মা ডুবি? বলতে বলতে নেমে পড়লেন গঙ্গায়।

হৃদর খবর পেয়ে এঁটো হাতে ছুটে এলো।

পাড়ে উঠে ঠাকুর ভাবলেন, আজ এমন হলো কেন? ওরা সঞ্চয় করে দিয়েছিল যে মশলার পুঁটলি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ঠাকুরের অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হয়ে উঠছে।

কাশীপুরের বাগানবাড়িতে আছেন ঠাকুর। সুরেশ মিত্তির ভাড়া দেয়।

দোতলায় হলঘরটিতে ঠাকুর থাকেন। দক্ষিণে একটি ছোট ঘেরা ছাদ। মা থাকেন সেখানে। একদিন ঠাকুর বললেন, যারা লাভের আশায় এসেছিল তারা সব চলে যাচ্ছে। বলছে অবতারের আবার ব্যারাম কি? ও সব মায়া?

ঠাকুর খাবার ধরে দিলেন নরেনকে। বললেন তুই খা।

সারদা চমকে উঠলেন। মনে পড়ল ঠাকুর বলেছিলেন, যখন দেখবে আমি নিজে না খেয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দিচ্ছি, বুঝবে আমার আর দেরি নাই।

শ্রীমা বললেন, না তুমি খাও।

শ্রীমা তারকেশ্বরে গেলেন হত্যা দিতে।

হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন। একদিন শুনলেন কে যেন পর পর হাঁড়ি সাজিয়ে রেখে ভেঙ্গে ফেলছে।

শ্রীমা ফিরে এলেন।

সব জেনেও ঠাকুর প্রশ্ন করলেন, কি গো হলো না তো?

১২৯৩ সালের, ভাদ্রমাসের সোমবার একদিন ঠাকুর ডেকে পাঠালেন শ্রীমাকে।

দেখ আমার এবার ব্রহ্ম ভাবের উদয় হচ্ছে।

শ্রীমা বিচলিত হলেন। বুঝলেন শেষের সে সময়টি এসে গেছে।

ঠাকুর বললেন, দেখ আমি যেন কোথায় চলেছি। যেন অনন্তের দিকে যাত্রা করেছি।

শ্রীমা সব বুঝলেন, কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

কেঁদ না ঠাকুর বললেন, জন্ম, মৃত্যু এঘর ওঘর। এঘরে না থেকে ওঘরে যাচ্ছি। যারা এঘরে রইল তুমি তাদের দেখবে। তোমার অনেক কাজ বাকী। আমি যা করেছি এর শতগুণ তোমাকে করতে হবে।

ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হতে লাগল। মধ্যরাত্রিতে ঠাকুর সামাধিস্থ হলেন।

শ্রীমা কেঁদে উঠলেন, আমার কালীমা কোথায় গেল গো!

কালী মাই তো, রাখাল এলো দক্ষিণেশ্বরে দেখল যেন কেশ এলিয়ে বসে আছে মা কালী।

তারক এলো দক্ষিণেশ্বরে সেও তাই দেখল। ঠাকুর নয় স্বয়ং কালী বসে আছেন।

ঠাকুরের চিতাভস্ম নিয়ে ঝগড়া বাধল গৃহী আর সন্ন্যাসী ভক্ত-দের। একদিকে রামদত্ত আর গৃহী ভক্তরা অন্যদিকে সন্ন্যাসী ভক্তরা। রামদত্তের ইচ্ছা ভস্ম থাকুক তার বাগানে। মন্দির বানিয়ে চিতাভস্ম রাখবে। সন্ন্যাসীরা বলে, এভস্মে আমাদের উত্তরাধিকার। রামদত্তই ভস্মপূর্ণ কলসি নিয়ে গেল। কিন্তু সন্ন্যাসীরা তার আগেই বেশির ভাগ সরিয়ে ফেলেছে।

শ্রীমা দুঃখ করে বললেন, এমন সোনার ঠাকুর যদি চলে গেলেন, তার ভস্ম নিয়ে ঝগড়া কেন?

শেষ